১৩.৪.১ প্রধান প্রধান ভূমি দূষক (Major Land Pollutants)

যে সমস্ত পদার্থ মৃত্তিকা তথা ভূমিকে দূষিত করে সেগুলি হল নিম্নরূপ।

ক) **অজৈব দূষক (Inorganic Pollutants) :** শিল্প সংস্থা, পৌর সংস্থা এবং কৃষিক্ষেত্রের বর্জিত আবর্জনার অপরিকল্পিত স্তূপীকরণের ফলে ভূমি দূষিত হয়ে থাকে। খনি শিল্প, ধাতু শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, কাগজ শিল্প, রঙ উৎপাদন কেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী সংস্থা ইত্যাদি থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে অজৈব বিষাক্ত ধাতু যথা—সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, লবণ, অ্যাসিড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয়। পৌর সংস্থা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কঠিন বর্জ্য পদার্থ যেমন—ধাতব বস্তু, খাদ্যাংশ, গার্হস্থ্য জ্বালানীর অদাহ্য অংশ, ব্যবহৃত ব্যাটারী, কাগজ ইত্যাদি স্তূপীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন অজৈব রাসায়নিক পদার্থ ও ভারী ধাতু মৃত্তিকায় সংক্রামিত হয়। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকায় নাইট্রেট ও ফসফেটের আধিক্য ঘটে।

খ) **জৈব দূষক (Organic Pollutants) :** কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত জলে উপস্থিত অদ্রাব্য বিভিন্ন ধরনের জৈব ক্লোরিন (organochlorine) এবং কীটনাশক পদার্থগুলি (যেমন-ডি. ডি. টি., হেপ্টাক্লোর, অলড্রিন, ক্লোরডেন, এন্ড্রিন ইত্যাদি) অবিশ্লেষ্য প্রকৃতির হওয়ায় এদের বেশ কিছু অংশ মৃত্তিকায় অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। উদ্ভিদ মূল দ্বারা শোষিত হয়ে এগুলি উদ্ভিদকোষে পুঞ্জীভূত হয় এবং খাদ্য শৃঙ্খলের পথে মানবদেহে প্রবেশ করে ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। কীটনাশক ব্যতীত কৃষিক্ষেত্রে ও বাগানে ব্যবহৃত জৈব জীবাণুনাশক ও মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রক (soil conditioner) প্রয়োগের ফলেও বিভিন্ন ধরনের জৈব দূষক মৃত্তিকার সাথে যুক্ত হয়।

গ) **জৈব দূষক (Biological Pollutants) :** আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ, হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ (যথা-ব্যান্ডেজ, সূচ, সিরিঞ্জ), পৌরসংস্থা কর্তৃক বর্জিত আবর্জনা ইত্যাদিতে রোগ সৃষ্টিকারী নানাবিধ অণুজীব যথা—ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, আদ্যপ্রাণী (protozoa) এবং কৃমি উপস্থিত থাকে। এগুলি উদ্ভিদে সংক্রামিত হয় এবং খাদ্য শৃঙ্খলের পথে মানবদেহে প্রবেশ করে ও নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।

ঘ) **তেজস্ক্রিয় দূষক (Radioactive Pollutants) :** শিল্প সংস্থা ও পারমাণবিক পরীক্ষাগারের বর্জ্যবস্তু, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ যথা—স্ট্রনসিয়াম-৯০, সিজিয়াম-১৩৭, রুথেনিয়াম-১০৬, আয়োডিন-১৩১, রেডিয়াম-১০৬, রেডিয়াম-১৪০, ল্যান্থানিয়াম-১৪০, সিরিয়াম-১৪৪ ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং মৃত্তিকাকে দূষিত করে তোলে।

ঙ) **প্লাসটিক ও পলিথিন (Plastics and Polythene) :** ভূমি দূষণের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল যথেচ্ছভাবে প্লাসটিক ও পলিথিন দ্রব্যের ব্যবহার ও আবর্জনা হিসাবে সেগুলি ভূমিভাগে নিক্ষেপ করা। বালতি, গেলাস, কাপ, বাটি, সিরিঞ্জ, থলি, কলমের ভগ্নাংশ ইত্যাদি প্লাসটিক ও পলিথিন নির্মিত নানা ধরনের জিনিস যত্রতত্র স্তূপীকৃত করা হয়। এগুলি অবিশ্লেষ্য প্রকৃতির হওয়ায় অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায় এবং দীর্ঘ দিন এইভাবে থাকবার ফলে এগুলি থেকে নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি মৃত্তিকাকে দূষিত করে।

১৩.৪.২ ভূমি দূষণের উৎস সমূহ (Sources of Land Pollution)

ভূমি দূষণের প্রধান উৎসগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

ক) **শিল্প ও পৌরসংস্থার বর্জ্য পদার্থ (Industrial and Municipal Wastes) :** শিল্প ও পৌর সংস্থা নিঃসৃত কঠিন বর্জ্য পদার্থের স্তূপীকরণ ভূমি দূষণের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এর মাধ্যমে ভারী ধাতু, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, জৈব দূষক ইত্যাদি মৃত্তিকার সঙ্গে মেশে।

খ) **কৃষিকার্য (Agriculture) :** কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রক ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে উপরিস্তরের মৃত্তিকা দূষিত হয়। পশুপালন ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ (যথা—মল, খাদ্যাবশেষ ইত্যাদি)-এর স্তূপীকরণের মাধ্যমেও ভূমি দূষিত হয়। কৃষি খামার থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে রোগবাহী পতঙ্গ, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদির বংশবৃদ্ধি ঘটে। জৈব পদার্থের পচনের ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়।

গ) **তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ (Radioactive Wastes) :** পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, পারমাণবিক গবেষণাগার, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী হাসপাতাল ও শিল্প সংস্থা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ মৃত্তিকা তথা ভূমি দূষণের অন্যতম কারণ।

ঘ) **মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির হ্রাস (Decrease of Soil Fertility) :** উদ্ভিদকুল মৃত্তিকার উপরিস্তর থেকে অণুখাদ্য সংগ্রহ করে পুষ্টি সাধন করে থাকে। খনিজ পদার্থের আবহবিকার এবং অণুজীবীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে জৈবাবশেষের বিশ্লেষণ—এই দুই প্রক্রিয়ায় অণুখাদ্যগুলি মৃত্তিকায় সংযোজিত হয়। উদ্ভিদ এই অণুখাদ্যগুলি মৃত্তিকা থেকে গ্রহণ করে এবং খাদ্য শৃঙ্খলের পথে এগুলি উদ্ভিদদেহ থেকে অন্যান্য প্রাণীদেহে স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহাবশেষের বিশ্লেষণের ফলে অণুখাদ্যগুলি পুনরায় মৃত্তিকায় নীত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অণুখাদ্যের আবর্তন ব্যাহত হওয়ার ফলে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। একে "পরিপোষক দূষণ" (Nutrient Pollution) বলে। পরিপোষক দূষণের মূল কারণগুলি হল—একই শস্যের পুনরাবৃত্তি, পরপর দুটি চাষের অন্তর্বর্তী সময়ের ব্যবধান হ্রাস, অত্যধিক পরিমাণে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে অণুজীবগুলির মৃত্যু ইত্যাদি।

ঙ) **অম্লবৃষ্টি (Acid Rain) :** বায়ুমণ্ডলীয় সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে বিক্রিয়ায় যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বৃষ্টির জলের সাথে এই অ্যাসিডগুলি মৃত্তিকায় পতিত হয় একে অম্লবৃষ্টি বলে। এর ফলে মৃত্তিকার অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় মৃত্তিকার ধাতব ও জৈব আয়নগুলির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। ফলে উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে অণুখাদ্য শোষণ করতে পারে না।

চ) **প্রাণীর রেচন পদার্থ (Animal Excreta) :** মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মল, মূত্র ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থ মৃত্তিকা দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। মানুষের রেচন পদার্থের সঙ্গে অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকেটেরিয়া, পরজীবী কৃমি ইত্যাদি রোগবাহী অণুজীবগুলি মৃত্তিকায় সংক্রামিত হয়। এই মৃত্তিকায় জন্মানো শস্য, সব্জি ইত্যাদি ভক্ষণের মাধ্যমে মানবদেহে রোগ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণীর রেচন পদার্থের মাধ্যমেও রোগবাহক অণুজীবের সংক্রমণ ঘটে থাকে।

১৩.৪.৩ জীবমণ্ডলের উপর ভূমি দূষণের প্রভাব (Effects of Land Pollution on Biosphere)

ভূমি দূষকগুলি (বিশেষত ভারী ধাতুগুলি) খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং জীবদেহে নানা ধরনের কু-প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খরা (Drought) 2.3

'খরা' বলতে বোঝায় এমন একটি আবহাওয়াগত পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘসময় ধরে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে বাতাস, ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ এবং মৃত্তিকা শুষ্ক হয়ে গেছে, আর ফলস্বরূপ স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কোন এলাকায় কখন সরকারিভাবে খরা ঘোষণা করা হবে, সেটা নির্ভর করে ওই এলাকার সার্বিক জলবায়ু, ভূমিরূপ, মৃত্তিকা, ফসলের প্রকৃতির উপর। তাই দেশে দেশে খরার সংজ্ঞা বিভিন্ন। নিরক্ষীয় এলাকার বালিদ্বীপে প্রতিদিনই পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে টানা 6 বা তার বেশি দিন বৃষ্টি না হলে খরা পরিস্থিতি ধরা হয়। আবার মরুভূমির দেশ লিবিয়াতে টানা দু'বছর বৃষ্টি না হলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। Australian Bureau of Meteorology-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অস্ট্রেলিয়ার কোনো এলাকায় যদি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 10% বা তারও কম বৃষ্টি হয় এবং এই পরিস্থিতি টানা তিন মাস চলতে থাকে তবে খরা হয়েছে বলে ধরা হয়।

খরা বিভিন্নরকম হতে পারে, নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের খরা দেখানো হল—

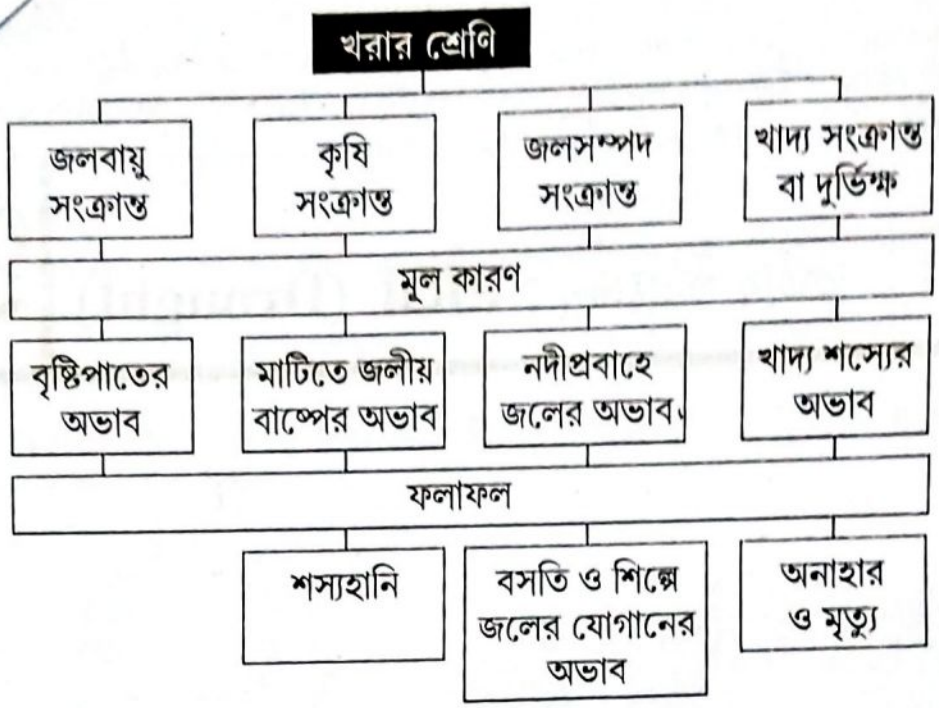

আমাদের দেশেও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে খরার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন IMD (Indian Meteorological Department) খরার জলবায়ু সংক্রান্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

খরার জলবায়ু সংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition of Meteorological Drought)

IMD দ্বারা গৃহীত খরা নীতি—

(1) **অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি ঃ** সাধারণত 70 থেকে 100 বছরের মোট বৃষ্টিপাতের গড়কে কোনো এলাকার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হিসেবে ধরা হয়। কোনো বছর যদি স্বাভাবিকের চেয়ে 20% বা তার অধিক বৃষ্টি ($\geq 20\%$) হয়, তবে তখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হবে।

(2) **স্বাভাবিক বৃষ্টি পরিস্থিতি ঃ** যেসকল বছরে কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে 19% বেশি থেকে 19% কমের মধ্যে থাকে (অর্থাৎ বৃষ্টিপাত +19% থেকে −19%-এর মধ্যে থাকে) তবে সেইসব বছরে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(3) **খরার সূত্রপাত ঃ** কোনো এলাকায় কোনো একটি বছরে যদি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হয়ে, তার 25% কম বৃষ্টি হয় (25% negative departure from normal rainfall) তবে সেই বছর সেই এলাকায় খরা হয়েছে বলতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃত বৃষ্টিপাত যদি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 75% মতো হয়, বা তার থেকেও কম হয়, তাহলে খরা হয়েছে বুঝতে হবে।

(4) **মাঝারি খরা পরিস্থিতি ঃ** প্রকৃত বৃষ্টিপাত যদি মোট স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 75% থেকে 50%-এর মধ্যে হয় (অর্থাৎ departure from normal rainfall : 25% to 50%) তাহলে ওই এলাকায় মাঝারি তীব্রতার খরা (Moderate drought) হয়েছে বুঝতে হবে।

(5) **তীব্র খরা পরিস্থিতি ঃ** প্রকৃত বৃষ্টিপাত যদি মোট স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 50%-এর থেকেও কম হয় (অর্থাৎ departure for normal >--50%) তবে ওই এলাকায় অতি তীব্র খরা (Severe drought) হয়েছে বুঝতে হবে।

(6) কোনো এলাকায়, যেমন ধরা যাক কোনো এক বছরে বাঁকুড়া জেলায় যদি মোট এলাকার 20% বা তার বেশি খরা পীড়িত হয়, তবে সেই জেলাটিকে ওই বছরে খরা আক্রান্ত বলা হয়।

(7) কোনো এলাকায় 100 বছরের মধ্যে যদি 20 বার বা তার বেশি খরার ঘটনা ঘটে, তবে ওই এলাকাটিকে সাধারণভাবে খরা আক্রান্ত (Drought affected area) বলা হবে।

(8) যদি 100 বছরের মধ্যে 40 বার বা তারও বেশি সংখ্যক বছরে খরার আক্রমণ ঘটে তবে ওই এলাকাটিকে তীব্র খরাপ্রবণ (Chronically drought prone area) বলা হবে।

খরার কৃষিসংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition of Agricultural Drought)

আবার ভারতবর্ষের কৃষিসংক্রান্ত খরার সংজ্ঞা বা দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। NCA (National Commission of Agriculture)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খরিফ মরশুমে পরপর চার সপ্তাহে যদি প্রকৃত বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের 50% বা তার কম হয়, তখন তাকে খরা বলা হবে। রবি মরশুমে এই একই সংজ্ঞায় কেবল চার সপ্তাহের বদলে ছয় সপ্তাহ ধরা হবে। অর্থাৎ ফসল তার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ আর্দ্রতা না পেয়ে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকেই এক্ষেত্রে খরা বলা হবে।

খরার জলসম্পদ সংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition of Hydrological Drought)

জলসম্পদ সংক্রান্ত সংজ্ঞাও খরার জন্য দেওয়া যায়, কোনো স্থানে ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয়, নদী প্রভৃতিতে বা ভূগর্ভস্থ জলস্তরে, জলের উচ্চতা যদি স্বাভাবিকের থেকে 75% বা তার বেশি নেমে যায় এবং ফলস্বরূপ নদী, জলাশয়, ঝরনার জল শুকিয়ে যায়, তবে ওই স্থান খরা পীড়িত বলা যায়।

খরার অর্থনৈতিক সংজ্ঞা (Definition of Economic Drought)

খরার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। তাই উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞাও খরার জন্য দেওয়া যেতে পারে। কোনো এলাকায় ফসল উৎপাদন যদি এমন কমে যায়, যাতে সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনও ওই এলাকা খরা পীড়িত বলা যাবে।

এক নজরে খরা সৃষ্টির কারণ

(1) প্রধান কারণ হল আবহাওয়ার অস্থিরতায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া। এই বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন—

(ক) মৌসুমি বৃষ্টির অনিশ্চয়তা (স্থানীয় প্রভাব)।

(খ) আবহাওয়ার উষ্ণায়ণ (Global warming) বিশ্বব্যাপী প্রভাব।

(গ) প্রচুর গাছ কেটে ফেলার জন্য আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া।

(ঘ) আধাশুষ্ক অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে তৃণাচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

(ঙ) প্রাকৃতিক কারণে মরুকরণের গ্রাসে পড়া।

(2) বৃষ্টি স্বাভাবিক আছে, কিন্তু ভূমিরূপের জন্য সব জল গড়িয়ে চলে যায়, মাটিতে একটুও জল সঞ্চিত হয় না, সবসময় শুষ্ক থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতেও খরার সৃষ্টি হতে পারে।

খরা সৃষ্টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা

জলবায়ুসংক্রান্ত খরা বা Meteorological drought-এর কারণ—

কোনো অঞ্চলের জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের অভাবজনিত খরা পরিস্থিতিতে মনে রাখতে হবে যে, **বৃষ্টির পরিমাণের চাইতে বৃষ্টির কার্যকারিতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।** ছাত্রছাত্রীরা সবাই জানে যে, চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি থেকে সমস্ত বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের অঞ্চলে চলে যায়। তাই চেরাপুঞ্জি ওই প্রচণ্ড বৃষ্টির সুফল পায় না। এটি একটি শুষ্কপ্রায় অঞ্চল।

ভারতবর্ষে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হল 105 সেন্টিমিটার। পৃথিবীর নিরিখে এই পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত ভারতের সব জায়গায় সমভাবে বণ্টিত নয়। আবার বছরের সব সময়ে বৃষ্টি হয় না। সুতরাং সময় এবং স্থান দুটির নিরিখেই বৃষ্টি অসমভাবে বণ্টিত। এর সঙ্গে আবার মনে রাখতে হবে প্রতি বছর এই বণ্টনের হার সমান থাকে না। বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের গুণক (Coefficient of variation-C) নিম্নলিখিতভাবে গণনা করা যায়।

(b) ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ (surface run-off) কমানো এই দুটি প্রক্রিয়া না সংঘটিত হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, ফলে স্থানীয় বৃষ্টিপাত কমে যায়।

এ ছাড়াও গাছ কেটে ফেললে বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে **আবহাওয়ার উষ্ণায়ন** আরও দ্রুত হয়। ফলে মাটি ও বাতাস দ্রুত শুকিয়ে যায়। বৃষ্টি আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

(৪) মরুকরণ বা desertification প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৃষ্টি কমে যাওয়ার যোগ আছে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং মানুষের অবৈজ্ঞানিক বেহিসেবি কার্যকলাপের ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ জল ও ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের অতিরিক্ত ক্ষয়ের ফলে মরুকরণ হয়। ফলে গাছপালা জন্মায় না এবং বৃষ্টিপাত আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

(9) মাটির লবণায়ন বা salinisation-এর ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়, বনসম্পদ নষ্ট হয়। তার ফলেও বৃষ্টির অনিশ্চয়তা বাড়ে।

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা সৃষ্টির কারণ

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা বা Hydrological drought-কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Surface water drought)

(2) ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Ground water drought)

Surface water drought-এর কারণ—

(a) পাহাড়ি অঞ্চলে উন্নয়নের নামে নদী উপত্যকায় বনাঞ্চল কেটে ফেলা হয়। ফলে এলাকার মাটি একটুও জল ধরে রাখতে পারে না। বর্ষার সময়ে নদী জলপ্রপাত ঝরনা প্রভৃতি পথ দিয়ে দ্রুত জল গড়িয়ে নীচু এলাকায় সরে যায়। বর্ষা কেটে গেলে ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ শুকিয়ে যায়। মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ভয়ানক জলকষ্ট শুরু হয়। চেরাপুঞ্জিতে প্রতি বছর ঠিক এই ঘটনাই ঘটে।

(b) নদী উপত্যকার বনাঞ্চল কেটে ফেলে সেখানে বাগিচা কৃষি তৈরি করলেও খরার সমস্যাকে ডেকে আনা হয়। স্বাভাবিক বন কেটে অর্থনৈতিক লাভের জন্য পাইন বা ইউক্যালিপ্টাসের চাষ করা হয়। এই গাছগুলির মাথায় পাতার আস্তরণ (Canopy cover) ঘন নয়। বৃষ্টিকে আটকাতে পারে না। প্রবল বৃষ্টি সরাসরি মাটিকে আঘাত করে ভূমিক্ষয় ঘটায়। হড়কা বান বা flash flood-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর বছরের শুষ্ক সময়ে অঞ্চলটি খরাপীড়িত হয়ে পড়ে। উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে। ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় গাছগুলির বাষ্পায়ন-প্রস্বেদন হার (evapotranspiration rate) খুব বেশি হওয়ার কারণে আবহাওয়া ও মৃত্তিকার জল আরও বেশি করে শুষ্ক হয়ে যায়। ফলে খরার তীব্রতা বাড়ে।

(c) অবৈজ্ঞানিক প্রথায় খনির কাজ, রাস্তা তৈরি, অতিরিক্ত পশুচারণ, কৃষি ইত্যাদির ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা সৃষ্টি হয়। দুন উপত্যকায় চুনা পাথরের খনিগুলি নদীর প্রবাহ এমনভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, বর্ষাকালে নদীতে প্রবল বন্যা এবং শুষ্ক সময়ে খরার সৃষ্টি হয়।

এইভাবে কোনো এলাকায় জলসম্পদের ভারসাম্যের অভাব ঘটলে, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিতেও তীব্র খরার সৃষ্টি হতে পারে।

Ground water drought-এর কারণ ঃ ভূগর্ভস্থ জলস্তর থেকে পাম্প করে অতিরিক্ত জল তুলে নিয়ে চাষাবাদ ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার ফলে ভূগর্ভে জলের ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিতেও খরার সৃষ্টি হতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এমনিতেই পাথুরে জমির জন্য জল মাটির ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তোলে।

ভারতবর্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 500 ফুটের কম গভীর অ্যাকুইফারের ব্যবহার হয়। ধনী কৃষকেরা শক্তিশালী পাম্প বসিয়ে মাটির তলা থেকে জল তুলে খরা পরিস্থিতি দূর করে নানান ফসল ফলাচ্ছে। এই কাজের জন্য স্বাভাবিক জলস্তর অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে গরিব চাষিরা যারা সাধারণ কূপ-নলকূপের উপর নির্ভর করে, শক্তিশালী পাম্প কিনতে পারে না,

তারা জল পাচ্ছে না। তাদের জন্য খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। একই এলাকায় ধনীদের বেহিসেবি জল ব্যবহারের জন্য শুধু দরিদ্ররা খরায় আক্রান্ত হচ্ছে।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এলাকায় পাম্পের সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। খরা আরও তীব্র হচ্ছে।

বছরের শুষ্ক সময়ে কৃষি এবং মূলত আঙুর, শাকসবজি, ফুল প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের চাষের জন্য এই সমস্যা আরও বাড়ছে। কোলার এবং অন্যান্য আধাশুষ্ক অঞ্চলে এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে এই ধরনের খরার উদাহরণ বেশি দেখা যায়।

রাস্তা তৈরি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি তথাকথিত উন্নয়নের জন্য ভূপৃষ্ঠের উপরের খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি দিয়েই জল ভূগর্ভে অ্যাকুইফারে অনুপ্রেবশ করে, Groundwater recharge হয়। Recharging এলাকাগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার ফলে এই ধরনের খরা আরও তীব্র হয়।

কৃষিসংক্রান্ত খরা বা Agricultural drought ঃ কৃষিসংক্রান্ত খরা আলোচনা করার আগে শুষ্কতা সূচক বা Aridity index কী বুঝে নেওয়া দরকার।

$$\text{AI (Aridity index)} = \frac{\text{PET-AET}}{\text{PET}} \times 100$$

PET = Potential evopotranspiration বা বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন সর্বোচ্চ যতটা হতে পারে

AET = Actual evopotranspiration বা বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন প্রকৃতপক্ষে কত হয়েছে।

বছরের প্রতি সপ্তাহে AI নির্ণয় করা হয়। এবার বছরের ওই সময়ে স্বাভাবিক যা থাকা উচিত সেই তুলনায় কত কম আছে (negative anomaly) সেটা হিসেব করা হয়। সেই অনুযায়ী কৃষিজ ফসল কোনোরকম আর্দ্রতার অভাব (moisture stress) অনুভব করছে কি না, তা হিসাব করা হয়।

শুষ্কতা সূচকের স্বাভাবিকের চেয়ে কত কম (negative anomaly) তার উপর নির্ভর করে কৃষি সংক্রান্ত খরার শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

AI anamoly	Severity class
1-25	অল্প খরা (mild arid)
26-50	মাঝারি খরা (moderate arid)
> 50	তীব্র খরা (Severe arid)

AI-এর পাশাপাশি অনেক সময় MAI or Moisture availability index-ও হিসাব করা হয়। IMD, দেশের বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে (agroclimatic zone) অবস্থিত 169টি স্টেশনের সংগৃহীত তথ্য দিয়ে সাপ্তাহিক AI anomaly মানচিত্র নির্মাণ করে।

কৃষি সংক্রান্ত খরা বা Agricultural drought-এর কারণ : ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লব ঘটার পর কৃষি সংক্রান্ত খরার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। কারণ—উচ্চফলনশীল ফসল প্রজাতি চাষ করতে বেশি জলের দরকার হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেখানে কেবলমাত্র উচ্চফলনশীল গম চাষ (wheat monoculture) হয়, সেখানে কৃষি-খরা সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যুগ যুগ ধরে প্রচলিত, সময়-পরীক্ষিত ভূমি ব্যবহার রীতি এবং ফসল নির্বাচন এই নতুন সবুজ বিপ্লবে প্রয়োগ করা হয় না। ফলে সমস্যা বাড়ে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের আধাশুষ্ক অঞ্চলে, আগে নিম্নমানের মিলেট চাষ হত, জলও কম প্রয়োজন হত। ওই সব স্থানে এখন বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে আখ, আঙুর, অথবা ধান চাষ হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হলেও কৃত্রিম খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

অর্থনৈতিক খরা বা Economic drought-এর কারণ—ফসল উৎপাদন নানান কারণে কমে যেতে পারে। যেমন— অবৈজ্ঞানিক প্রথায় এবং অতিরিক্ত খননকার্যের ফলে মাটিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। কেননা খনি তৈরির জন্য প্রচুর অরণ্য ধ্বংস হয়। প্রস্বেদন হার কমে গিয়ে আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যায়। মাটির জলধারণক্ষমতা কমে যায়। খনি থেকে উদ্ভূত বিপজ্জনক তরল বর্জ্য মাটিতে, ভূপৃষ্ঠস্থ জলে মিশে গিয়ে মাটির স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে।

অতিরিক্ত এবং পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের জন্যেও মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও উর্বরতা কমে যেতে পারে। কংক্রিট নির্মাণের আতিশয্যের কারণে ভূগর্ভে জল প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। জনসংখ্যার চাপ ও নানান শিল্পের জন্য প্রচুর জল ভূগর্ভ থেকে তুলে নেওয়া হয়। ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায়। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিতেও জলকষ্ট শুরু হয় এবং কৃত্রিম খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ভারতবর্ষের খরা আক্রান্ত অঞ্চল (Drought affected areas of India) :

(1) গুজরাট

(2) রাজস্থান এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সংলগ্ন অঞ্চল

(3) উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ

(4) মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ

(5) মহারাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল

(6) কর্ণাটকের মধ্যাঞ্চল

(7) রায়াল সীমা

খরার অর্থনৈতিক সংজ্ঞা (Definition of Economic Drought)

খরার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। তাই উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞাও খরার জন্য দেওয়া যেতে পারে। কোনো এলাকায় ফসল উৎপাদন যদি এমন কমে যায়, যাতে সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনও ওই এলাকা খরা পীড়িত বলা যাবে।

এক নজরে খরা সৃষ্টির কারণ

(1) প্রধান কারণ হল আবহাওয়ার অস্থিরতায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া। এই বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন—

(ক) মৌসুমি বৃষ্টির অনিশ্চয়তা (স্থানীয় প্রভাব)।

(খ) আবহাওয়ার উষ্ণায়ণ (Global warming) বিশ্বব্যাপী প্রভাব।

(গ) প্রচুর গাছ কেটে ফেলার জন্য আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া।

(ঘ) আধাশুষ্ক অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে তৃণাচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

(ঙ) প্রাকৃতিক কারণে মরুকরণের গ্রাসে পড়া।

(2) বৃষ্টি স্বাভাবিক আছে, কিন্তু ভূমিরূপের জন্য সব জল গড়িয়ে চলে যায়, মাটিতে একটুও জল সঞ্চিত হয় না, সবসময় শুষ্ক থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতেও খরার সৃষ্টি হতে পারে।

খরা সৃষ্টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা

জলবায়ুসংক্রান্ত খরা বা Meteorological drought-এর কারণ—

কোনো অঞ্চলের জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের অভাবজনিত খরা পরিস্থিতিতে মনে রাখতে হবে যে, **বৃষ্টির পরিমাণের চাইতে বৃষ্টির কার্যকারিতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ**। ছাত্রছাত্রীরা সবাই জানে যে, চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি থেকে সমস্ত বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের অঞ্চলে চলে যায়। তাই চেরাপুঞ্জি ওই প্রচণ্ড বৃষ্টির সুফল পায় না। এটি একটি শুষ্কপ্রায় অঞ্চল।

ভারতবর্ষে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হল 105 সেন্টিমিটার। পৃথিবীর নিরিখে এই পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত ভারতের সব জায়গায় সমভাবে বন্টিত নয়। আবার বছরের সব সময়ে বৃষ্টি হয় না। সুতরাং সময় এবং স্থান দুটির নিরিখেই বৃষ্টি অসমভাবে বন্টিত। এর সঙ্গে আবার মনে রাখতে হবে প্রতি বছর এই বন্টনের হার সমান থাকে না। বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের গুণক (Coefficient of variation-C) নিম্নলিখিতভাবে গণনা করা যায়।

$$C = \frac{\text{মাসিক/বার্ষিক বৃষ্টিপাতের Standard deviation}}{\text{মাসিক/বার্ষিক বৃষ্টিপাতের Mean}} \times 100$$

কোনো এলাকার C-এর মান যত কম হবে, বুঝতে হবে সেখানে বৃষ্টিপাতের খুব একটা হেরফের হয় না। নিশ্চিত বৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনো অঞ্চলে C-এর মান খুব বেশি হয়ে গেলে বুঝতে হবে বৃষ্টি সেখানে খুবই অনিশ্চিত।

রাজস্থান, গুজরাট, কচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলে C-এর মান 50%-80%। দাক্ষিণাত্য মালভূমির অভ্যন্তরে C-এর মান 30%-50%। সুতরাং বোঝা যায় রাজস্থান, গুজরাট অঞ্চল ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি খরা প্রবণ। কারণ বৃষ্টি এখানে অনেক বেশি অনিশ্চিত।

কোনো স্থানে আবহাওয়ার অস্থিরতায় বৃষ্টি কমে যেতে পারে। বৃষ্টি কম হওয়ায় কারণগুলি হল—

(1) ক্রান্তীয় অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, যেমন—

(a) দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর দেরিতে আসা।

(b) মৌসুমি বায়ুর চাপীয় অক্ষ (axis of the monsoon trough)-এর বিশেষ অবস্থান।

(c) মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে অসমভাবে বণ্টিত হওয়া।

(d) মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিভিন্ন বছরে অসমভাবে বণ্টিত হওয়া।

(2) উপক্রান্তীয় (Subtropical) অঞ্চলে বৃষ্টি না হওয়ার মূল কারণ হল উচ্চচাপযুক্ত বায়ুকক্ষের আয়তন বৃদ্ধি এবং বেশিদিন ধরে এক স্থানেই থেকে যাওয়া। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের খরা মূলত এই কারণেই হয়।

(3) সমুদ্রে শীতল স্রোত স্ফীত হয়ে উঠে সমুদ্রের গড় পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (average surface temperature) যদি কমে যায়, তবে সংলগ্ন বাতাসও শীতল হয়ে পড়ে। ফলে বাতাস প্রসারিত হয়ে যথেষ্ট জল টেনে নিতে পারে না এবং কম বৃষ্টি ঘটায়, ক্যালিফোর্নিয়া এবং চিলিতে প্রায়শই এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

(4) মধ্য অক্ষাংশীয় ঝড়ের গতিপথ পরিবর্তন ওই এলাকায় বৃষ্টি না হওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রকি পর্বতমালার পূর্বদিকের সমভূমিতে এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

(5) **এলনিনো প্রভাব ঃ** প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের উষ্ণ জল, মহাসাগরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে ছুটে যায়। এই উষ্ণ জল

ক্রমাগত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে সরে যায় বলে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য পেরু সীমান্তে গভীর সমুদ্র থেকে ঠান্ডা জল স্ফীত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠে আসে। ফলে পেরু সীমান্তে বায়ুর উচ্চচাপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়।

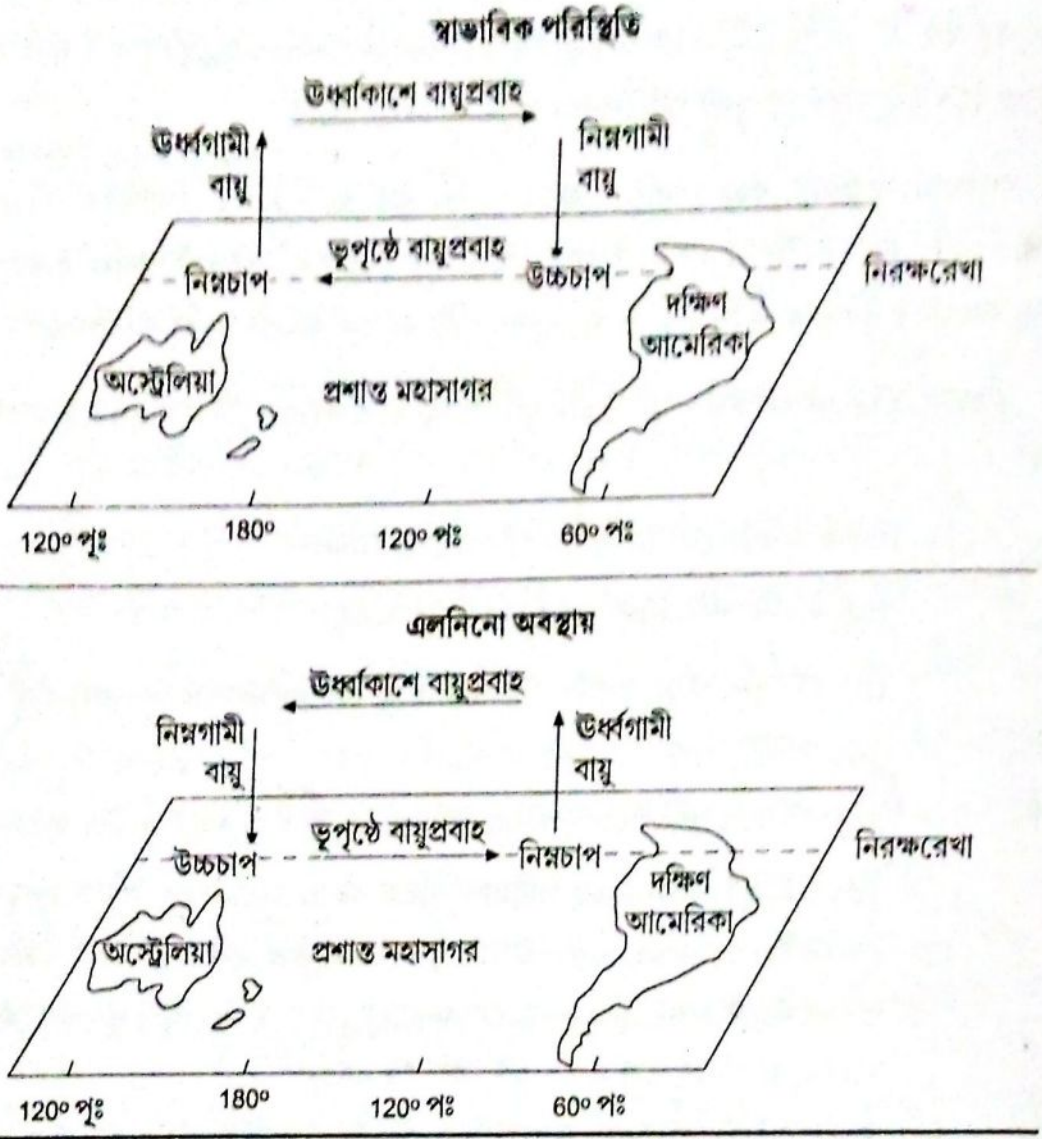

চিত্র 2.3.1 : স্বাভাবিক অবস্থায় এবং এলনিনোর ফলে সৃষ্ট বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের পরিস্থিতি।

সূত্র ঃ Siddhartha, 2007

দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু আড়াআড়িভাবে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার সময় প্রচুর জল টেনে নেয় এবং ভারতসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টি ঘটায়। ঊর্ধ্বাকাশে ঠিক বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। এই প্রবাহপথ আবহবিদদের কাছে বাতাসের 'ওয়াকার কক্ষ' নামে পরিচিত। কোনো কোনো বছরে ওয়াকার কক্ষ দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। ওই বাতাস তখন আর পেরু সীমান্ত থেকে উষ্ণ সমুদ্র জলকে সরাতে পারে না। এই উষ্ণ স্রোতই হল এলনিনো, স্প্যানিশ ভাষায় যার অর্থ শিশু যীশু। সেই

বছরে শীতল পেরু স্রোত বা হামবোল্ড স্রোতের দেখা মেলে না। সমুদ্রের জল স্বাভাবিকের তুলনায় অন্তত 10° সেন্টিগ্রেড উষ্ণ হয়ে পড়ে। এই সময়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি উলটে যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর বায়ুর উচ্চচাপ ও পেরু সীমান্তে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না এবং খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

(6) কোনো কোনো বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগমনের ঠিক আগে ফিন্ডলেটার (Findlater) জেট বায়ুপ্রবাহের ধাক্কায় পূর্ব আফ্রিকার প্রান্ত থেকে শীতল সোমালি স্রোত আরবসাগরে ঢুকে পড়ে এবং আরবসাগরের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (Surface temperature) অন্তত 10°C কমিয়ে দেয়। ফলে বাষ্পীভবন ও মেঘবৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়।

(7) **বিশ্বব্যাপী অরণ্যহনন বা Deforestation** বৃষ্টি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বনাঞ্চল জলচক্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে—

(a) বাষ্পায়ন—প্রস্বেদন হার (rate of evapotranspiration) বাড়ানো,

(b) ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ (surface run-off) কমানো এই দুটি প্রক্রিয়া না সংঘটিত হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, ফলে স্থানীয় বৃষ্টিপাত কমে যায়।

এ ছাড়াও গাছ কেটে ফেললে বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে **আবহাওয়ার উষ্ণায়ন** আরও দ্রুত হয়। ফলে মাটি ও বাতাস দ্রুত শুকিয়ে যায়। বৃষ্টি আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

(8) মরুকরণ বা desertification প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৃষ্টি কমে যাওয়ার যোগ আছে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং মানুষের অবৈজ্ঞানিক বেহিসেবি কার্যকলাপের ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ জল ও ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের অতিরিক্ত ক্ষয়ের ফলে মরুকরণ হয়। ফলে গাছপালা জন্মায় না এবং বৃষ্টিপাত আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

(9) মাটির লবণায়ন বা salinisation-এর ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়, বনসম্পদ নষ্ট হয়। তার ফলেও বৃষ্টির অনিশ্চয়তা বাড়ে।

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা সৃষ্টির কারণ

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা বা Hydrological drought-কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Surface water drought)

(2) ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Ground water drought)

(2) জলাশয়, কূপ, নলকূপ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে, নিরাপদ পানীয় জল অমিল হয়ে পড়ে।

(3) অশক্ত, অপুষ্ট, অনাহারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ময়লা জল বাহিত রোগ যেমন—কলেরা, আমাশয়, ডায়েরিয়া প্রভৃতি মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ে। অপুষ্টি ও ভিটামিনের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগ যেমন—ক্ষীণ দৃষ্টি, রাতকানা এগুলিরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

(4) আবহাওয়ায় তাপপ্রবাহ চলার কারণে প্রচুর গৃহহীন মানুষ মারা যায়।

খরা প্রতিরোধের উপায়

দু'রকমভাবে খরা প্রতিরোধ করা যেতে পারে—

(1) খরা প্রবণ এলাকায় দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা দ্বারা সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা।

(2) খরা আক্রান্ত এলাকায় স্বল্পকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া।

(1) দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ঃ

(ক) খরা প্রবণ এলাকার পরিসর সঠিকভাবে চিহ্নিত করে, সেখানে খরার প্রকৃত কারণ কি, তা অনুধাবন করতে হবে।

(খ) এলাকায় ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ প্রাপ্য জলের পরিমাণ কত হতে পারে তা পরিমাপ করার পর, কীভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে, এলাকা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। এবং সাধারণ মানুষকে এই পরিকল্পনায় সক্রিয় শরিক করতে হবে, যাতে পরিকল্পনা প্রকৃত ফলপ্রসূ হয়।

(গ) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rainwater harvesting) করা যেতে পারে।

(ঘ) জমির ঢালের মুখে ছোটো ছোটো প্রাচীর তৈরি করে, জল আটকানো যেতে পারে।

(ঙ) খরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষ করতে হবে।

(2) স্বল্পকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

(ক) খরা শুরু হলে, অবস্থা অনুযায়ী ফসলের প্রকার, বা চাষের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে হবে। কৃষকদের পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক পরামর্শ পৌঁছে দিতে হবে। খরিফ মরশুমে চাষ মার খেলে, রবি ফসল কতটা বেশি উৎপন্ন করা যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

(খ) মানুষ ও গবাদি পশুর পানীয় জল ও পশুখাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কৃষক পরিবার যাতে অনাহারে না মরে, তার জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা বা ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্নরকম খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করা যেতে পারে ?

Meteorological drought প্রতিরোধের উপায়—

ভারতবর্ষের মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি অনিশ্চিত, ঊর্ধ্বাকাশে জেটস্ট্রিমের প্রবাহ, মৌসুমি অক্ষের অবস্থান, ওয়াকার কক্ষের প্রকৃতি, এল নিনো প্রভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। তাই মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময়, বণ্টন ও পরিমাণ নিশ্চিত করার কোনো উপায় মানুষের হাতে নেই।

কাজেই এক্ষেত্রে একটা কাজই করা যেতে পারে। সেটা হল কোন বছরে বৃষ্টিপাত কেমন হতে পারে, তার পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করা।

Indian Meteorological Department বা IMD-এর তত্ত্বাবধানে সারা ভারতবর্ষের অসংখ্য ছোটো-বড়ো আবহাওয়া কেন্দ্রে বিভিন্নরকম আবহাওয়া তথ্য সারাবছর ধরে সংগ্রহ করা হয়। তারপর পুণের মূল অফিসে ওই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।

ভারতবর্ষে জিওস্টেশনারি কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট (Indian National Satellite)-এর সাহায্যে প্রতিদিনের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এ ছাড়া ভারতের কৃষি দপ্তরের ও দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় আবহাওয়া তথ্যসংগ্রাহক কেন্দ্র আছে।

এই সকল তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন—

(a) Dynamic Stochastic Transfer Model,

(b) Regression Model,

(c) Medium Range Weather Forecasting System প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ করার পর আগামী বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি কেমন হতে পারে তার আভাস পাওয়া যায়। তবে মৌসুমির বৃষ্টির অনিশ্চিত প্রকৃতির জন্য কোনো পূর্বাভাসই 100% মিলে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে যদি আভাস পাওয়া যায় যে, আগামী ঋতুতে বৃষ্টি কম হতে পারে, তবে আগে থেকেই সাবধান হওয়া যায়। খাদ্যশস্যের সঞ্চয় বাড়িয়ে নেওয়া যায়। আগে থাকতেই আমদানির

ব্যবস্থা করে রাখা যায়। খরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা যায়। কৃষকদের আগে থেকে সচেতন করা যেতে পারে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য আগে থাকতেই বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Hydrological drought প্রতিরোধের উপায়—

এই ধরনের খরা তিনভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে—

(a) জৈব পদ্ধতি (Biological method)

(b) প্রযুক্তিগত পদ্ধতি (Engineering method)

(c) স্থানীয় মানুষের খরা মোকাবিলায় যোগদান (Participation of local people)

জৈব পদ্ধতি—

এই পদ্ধতিতে প্রথমেই খরা আক্রান্ত এলাকায় অরণ্যহননের সমস্যা আছে কি না তা যাচাই করে নিতে হবে। কেননা গাছ কেটে ফেললে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশের হার কমে যায় এবং ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ও বন্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর মাটি জল ধরে রাখতে না পারার জন্য শুষ্ক ঋতুতে খরার সৃষ্টি হয়।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে ধাপে বনসৃজন এবং জলবিভাজিকা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এর ফলে বর্ষায় যেমন বন্যার সমস্যা কমবে, তেমন ভূগর্ভে জলস্তর বাড়বে এবং শুখা মরশুমে খরার সম্ভাবনাও কমে যাবে।

কোনো জায়গায় যদি একই ধরনের পাইন বা ইউক্যালিপ্টাসের বাগিচা থাকে, তবে ধীরে ধীরে জমির ব্যবহার বদল করে অন্য ধরনের গাছ লাগাতে হবে যাতে মাটি এবং চারপাশের আবহাওয়া অতিরিক্ত শুকিয়ে না যায়। বড়ো পাতার ছাউনি আছে (Canopy cover) আছে এমন গাছ লাগাতে হবে। ফলে মাটিতে সরাসরি বৃষ্টির কণার আঘাত লেগে ভূমিক্ষয় হবে না। আবার মাটিতে জল ঢুকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়িয়ে তুলবে।

প্রযুক্তিগত পদ্ধতি—

নানাধরনের প্রযুক্তির সাহায্যে ভূগর্ভে অ্যাকুইফারগুলিতে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। যেমন— পাহাড়ি অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহুতল বিশিষ্ট অরণ্য তৈরি করা যেতে পারে, যাতে ওই অরণ্যে বড়ো বড়ো গাছ, ছোটো গাছ, ঝোপঝাড়, লতাপাতা, ঘাস প্রভৃতি ধাপে ধাপে থাকে। এইরকম অরণ্য ভূপৃষ্ঠ প্রবাহে বাধা দেয়। ফলে অনেক বেশি জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

সমতলক্ষেত্রে বর্ষায় বন্যার জলকে বেরতে না দিয়ে বড়ো বড়ো গর্ত এবং খাত কেটে সেখানে জমিয়ে রাখা যেতে পারে। ওই জমা জল কিছুটা মাটির ভিতর ঢুকবেই এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বাড়িয়ে তুলবে।

আধাশুষ্ক অঞ্চলে বর্ষার সময়ে সৃষ্টি হওয়া ছোটো ছোটো নদীর মুখে মাটি পাথর দিয়ে ছোটো বাঁধ তৈরি করে জল আটকানো যায়। এই জলও মাটির তলায় কিছুটা ঢুকতে পারে।

পরিত্যক্ত কুয়োগুলিকেই এভাবে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে জল ঢোকানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমেদাবাদের কাছে কুরুক্ষেত্রে ঘগ্গর নদী উপত্যকায় সাইফন পাম্পের সাহায্যে জমা জল ভূগর্ভে পাঠানো হচ্ছে।

বর্ষার জল বড়ো বড়ো পুকুরে জমিয়েও এভাবে ভূগর্ভে ঢোকানো যেতে পারে।

বড়ো বড়ো খাল কেটে বৃষ্টিবহুল অঞ্চল থেকে শুষ্ক এলাকার জল নিয়ে আসা যেতে পারে। ভারতে রাজস্থান ক্যানাল প্রকল্প এইভাবেই জলস্ফীত হিমালয়ের নদীগুলি থেকে খাল কেটে থর মরুভূমির জয়সলমীর-বিকানির প্রভৃতি অঞ্চলে জল নিয়ে এসেছে।

স্থানীয় মানুষের খরা মোকাবিলায় যোগদান—

সাধারণ মানুষ খরা সম্পর্কে সচেতন ও প্রশিক্ষিত হলে সরকারি ব্যবস্থার ভরসায় না থেকে তারা নিজেরাই শ্রমদান করে, নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে জল সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটকে, রাজস্থানের বিভিন্ন গ্রামে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে।

এ ছাড়া কোনো এলাকায় খরা শুরু হয়ে গেলে কৃষি নির্ভর সাধারণ মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান প্রয়োজন। উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে এনে খাদ্যশস্যের সঠিক বণ্টন প্রয়োজন। খরাপীড়িত মানুষের কি ধরনের সাহায্য দরকার তা বুঝে সেইমতো ত্রাণ সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

Agricultural drought প্রতিরোধের উপায়—

এই ধরনের খরা মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

(1) খরা পরিস্থিতিতে সঠিক শস্য নির্বাচন করতে হবে।

(2) যেহেতু উচ্চফলনশীল শস্য চাষে বেশি জল লাগে, তাই সেগুলিকে বাদ দিয়ে, দেশীয় খরা প্রতিরোধী শস্য চাষ দরকার।

(3) আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক শস্যাবর্তন পালন করতে হবে।

খরা প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থা

আগে থাকতে পূর্বাভাস জানানোর জন্য এবং ব্যবস্থা নেবার জন্য অর্থাৎ প্রস্তুত থেকে খরা মোকাবিলার জন্য কৃষিদপ্তর একটি Weather watch group তৈরি করেছে। তা ছাড়া কৃষি ও সমবায় দপ্তরের জন্য মহাকাশ দপ্তর National Agricultural Drought Assessment and Management System (NADAMS) স্থাপন করেছে।

খরার মানচিত্র নির্মাণ (Drought Mapping)

যদিও আগে আমরা আলোচনা করেছি যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে খরার সংজ্ঞা দেওয়া যায়, মানচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে জলবায়ুসংক্রান্ত সংজ্ঞাটি গ্রহণ করলে আঁকার সুবিধা বেশি।

ধরা যাক, আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের 19টি জেলার 50 বছরের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হিসাব আছে। এবার দেখা যাক, আমরা মানচিত্র কীভাবে করব।

(1) প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের 19টি জেলার প্রত্যেকটি থেকে একটি করে প্রতিনিধি কেন্দ্র নির্বাচন করলাম, যার বৃষ্টিপাতের হিসাব ধরে গণনা করা হবে।

(2) যে-কোনো একটি কেন্দ্রের 50 বছরের বৃষ্টিপাত যোগ করে গড় বার করে ওই কেন্দ্রের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত গণনা করতে হবে। এভাবে 19টি কেন্দ্রেরই স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (Normal rainfall) পাওয়া যাবে।

(3) এবার প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 75% কত হয় তা গণনা করতে হবে।

(4) প্রতিটি কেন্দ্রে 50 বছরের হিসাবের মধ্যে যে যে বছরের বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের 75%-এর কম, সেইগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ জলবায়ু সংক্রান্ত খরার সংজ্ঞা অনুযায়ী ওই বছরে ওই কেন্দ্রে স্বাভাবিকের 25 শতাংশ বা আরও কম বৃষ্টি হয়েছে (–ve departure from normal rainfall $\geq$ 25%)। সুতরাং কেন্দ্রটি ওই বছরে খরায় আক্রান্ত।

(5) বিভিন্ন বছরে যে কেন্দ্রগুলি এই পদ্ধতিতে চিহ্নিত হল, সেগুলিতে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের 25% বা আরও কম তো জানা গেল, এবার জানতে হবে ওই বছরগুলিতে বৃষ্টিপাত কত কম তার প্রকৃত হিসাব (Actual –ve departure from normal rainfall), কারণ ওই বছরগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বিচ্যুতির মানগুলি দেখিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে বারগ্রাফ আঁকা যেতে পারে।

(6) এবারে এক-একটি কেন্দ্রে 50 বছরের মধ্যে এমন ঋণাত্মক বিচ্যুতি (–ve departure) ক'বার হয়েছে সেটা গুনতে হবে। ধরা যাক, দিনহাটাতে 50 বছরে 6

বার খরা হয়েছে। তবে 100 বছরে 12 বার হয়েছে। এইভাবে খরার পুনরাবৃত্তির হার শতাংশের হিসাবে (Drought frequency percentage) বার করতে হবে।

(7) এবারে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে শতাংশের হিসেবে ওই খরা-পুনরাবৃত্তির হার (Drought frequency percentage)-গুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে বসিয়ে আইসোপ্লেথ আঁকতে হবে। যেমন ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গে 5%, 10% এবং 15%—এই তিনটি আইসোলাইন টানা গেল। খরার সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো এলাকা 100 বছরে অন্তত কুড়িবার খরা আক্রান্ত না হয়, তবে এলাকাটিকে খরাপ্রবণ বলা যাবে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু স্থানে স্বল্পকালীন খরার ঘটনা ঘটলেও সার্বিকভবে রাজ্যটিকে খরাপ্রবণ বলা যাচ্ছে না।

(8) সংজ্ঞা অনুসারে কোনো বছরে কোনো এলাকার 20% অঞ্চল যদি খরা পীড়িত হয়, তবে সেই এলাকাটিকে খরায় আক্রান্ত বলে ঘোষণা করা যায়। এবারে আমাদের গণনাটিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ভাগ করলাম। উত্তরবঙ্গে আছে 6টি জেলায় 6টি কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গে আছে 13টি জেলায় 13টি কেন্দ্র। এবার উত্তরবঙ্গে যদি ($6 \times 20\% = 1.2$, অর্থাৎ এক-এর বেশি) অন্তত দুটি কেন্দ্রে খরা হয়, তবে ওই বছর উত্তরবঙ্গ খরাপীড়িত এমন বলা যাবে। একইভাবে কোনো বছরে দক্ষিণবঙ্গে ($13 \times 20\% = 2.6$), অন্তত তিনটি কেন্দ্রে যদি খরা হয়, তবে ওই বছর দক্ষিণবঙ্গে খরা হয়েছে ধরতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে ($1.2+2.6 = 3.8$) অন্তত চারটি কেন্দ্রে খরা হলে সেই বছর পুরো রাজ্যেই খরা পীড়িত ধরতে হবে। এই জিনিসটি ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যাবে।

বার খরা হয়েছে। তবে 100 বছরে 12 বার হয়েছে। এইভাবে খরার পুনরাবৃত্তির হার শতাংশের হিসাবে (Drought frequency percentage) বার করতে হবে।

(7) এবারে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে শতাংশের হিসেবে ওই খরা-পুনরাবৃত্তির হার (Drought frequency percentage)-গুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে বসিয়ে আইসোপ্লেথ আঁকতে হবে। যেমন ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গে 5%, 10% এবং 15%—এই তিনটি আইসোলাইন টানা গেল। খরার সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো এলাকা 100 বছরে অন্তত কুড়িবার খরা আক্রান্ত না হয়, তবে এলাকাটিকে খরাপ্রবণ বলা যাবে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু স্থানে স্বল্পকালীন খরার ঘটনা ঘটলেও সার্বিকভবে রাজ্যটিকে খরাপ্রবণ বলা যাচ্ছে না।

(8) সংজ্ঞা অনুসারে কোনো বছরে কোনো এলাকার 20% অঞ্চল যদি খরা পীড়িত হয়, তবে সেই এলাকাটিকে খরায় আক্রান্ত বলে ঘোষণা করা যায়। এবারে আমাদের গণনাটিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ভাগ করলাম। উত্তরবঙ্গে আছে 6টি জেলায় 6টি কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গে আছে 13টি জেলায় 13টি কেন্দ্র। এবার উত্তরবঙ্গে যদি ($6\times20\% = 1.2$, অর্থাৎ এক-এর বেশি) অন্তত দুটি কেন্দ্রে খরা হয়, তবে ওই বছর উত্তরবঙ্গ খরাপীড়িত এমন বলা যাবে। একইভাবে কোনো বছরে দক্ষিণবঙ্গে ($13\times20\% = 2.6$), অন্তত তিনটি কেন্দ্রে যদি খরা হয়, তবে ওই বছর দক্ষিণবঙ্গে খরা হয়েছে ধরতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে ($1.2+2.6 = 3.8$) অন্তত চারটি কেন্দ্রে খরা হলে সেই বছর পুরো রাজ্যেই খরা পীড়িত ধরতে হবে। এই জিনিসটি ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্যা
(Floods)

বন্যা হল এক ক্রমান্বয়ী বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ যা আবহাওয়ার উপাদানগুলির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দীর্ঘ সময়ভিত্তিক এক ক্রমান্বয়ী ফলাফল সৃষ্টি করে।

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যদিও তা সৃষ্টিতে মানুষেরও হাত রয়েছে। বন্যা কী? নদী যখন আগত জলরাশিকে তার গর্ভে ধরে রাখতে পারে না, তখন তা (River-bed) দুকূল ছাপিয়ে তীরবর্তী জনপদকে প্লাবিত করে।* একেই বন্যা বলে। Shakespeare তাঁর অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা-তে বন্যা ও মানুষের সম্পর্কের এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

They take the flow of the Nile

.....

The higher the Nilus Swells

The more the promises

---

* তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই বন্যা বলতে নদীসৃষ্ট বন্যার কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যদিও নদীর বন্যা ছাড়াও বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আরও সম্ভাবনা থাকে, যেমন জাপানে সাম্প্রতিককালে (মার্চ, 2011) সুনামির সময় ঘটে যাওয়া প্লাবন। ভেন্ টি চাউ (Ven te Chow, 1956) বন্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়েও নদীর সঙ্গে বন্যার সম্পর্ককেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে (A flood is a relatively high flow which overtakes the natural channel provided for the run off.)। বন্যা হল এমন এক বাড়তি জলের প্রবাহ যা স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য নির্দিষ্ট নদীখাতের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। রুজভেল্ট (Rostveldt) এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী (১৯৬৩) বন্যার সংজ্ঞাকে মানুষের বন্যারোধকারী চেষ্টা, কৃত্রিম প্রবাহপথ সৃষ্টি ইত্যাদির কথা মনে রেখে আরও বাস্তবসম্মত করতে চেয়েছেন : (''Flood is any high stream flow which over-tops natural on artificial banks of a stream.'')। বন্যা হল নদীর জলের এমন এক উচ্চমানের প্রবাহ যা নদীর প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পাড়গুলিকে ছাপিয়ে যায়। তবে এইসব সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার বাইরে সম্ভবত আর একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারের দিক দিয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞার প্রয়োজন। রয় ওয়ার্ড (Roy Ward, 1978) এই সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : (A flood is a body of water which rises to overflow land which is not normally submerged.) বন্যা হল এমন এক জলপ্রবাহ যা নদীর পাড় ছাপিয়ে যায় এবং সাধারণত ডুবে যায় না এমন এলাকাকে প্লাবিত করে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে কবি নীলনদের বন্যা ও মিশরবাসীদের তা থেকে উপকৃত হওয়ার যে দৃশ্য এঁকেছেন, আজকের মানুষ অনেকটা অজ্ঞতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে কথা মাথায় রাখে না। তাই অরণ্য ধ্বংস করে গড়ে ওঠে নতুন নতুন জনপদ ও কৃষিভূমি। শুরু হয় নদী উপত্যকা দখল। স্বাভাবিক কারণে নদীও তার আপন গতিপথ ফিরে পেতে চায়। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়, মানুষ ও নদীর মধ্যে এক যুদ্ধ। মানুষ চায় বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকাতে, নদীর পাড় বেঁধে ভূমিক্ষয় রোধ করতে। কিন্তু মানুষের এই নদী শাসন খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। বরং বন্যার ভয়াবহতা বাড়ে, বাড়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি। এবার বন্যার কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বন্যার কারণ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট, কিংবা উভয়বিধ হতে পারে। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল—

বন্যাকে সাধারণত একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ পৃথিবীর কোনো নদীই এখন আর মানুষের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, প্রায় সব নদীই নানাভাবে, কমবেশি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যা সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে মানুষের দ্বারা বন্যা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া বন্যাকে বিপর্যয় বলা যায় কি না তা নিয়েও বিতর্ক আছে। পৃথিবীর অনেকগুলি অঞ্চল বেশি মাত্রায় বন্যাপ্রবণ যেমন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপির বদ্বীপ, চিনের হোয়াংহো উপত্যকা, নিম্ন দামোদর উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গাঙ্গেয় সমভূমি, মায়ানমারের ইরাবতী, পাকিস্তানের সিন্ধু, আফ্রিকার নাইজার বদ্বীপ প্রভৃতি। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটিই ঘন বসতিযুক্ত এলাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং বন্যাকে কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়ে এইসব এলাকায় বাস করছেন ও জীবনধারণের উপযোগী কাজ খুঁজে পেয়েছেন। যে প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থানীয় মানুষ বিপদ হিসাবে গণ্য করে না, সেটিকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে নদী প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার করে চলেছে। আমরা জানি যে, 'মিশর নীল নদের দান'। কারণ নীল নদের প্লাবিত জলে প্রতি বছর যে বন্যা হত, তার মাধ্যমেই এই মরুপ্রায় দেশে পলল সঞ্চিত হত। বন্যার দান এই পলিমাটি সে দেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতির উন্নতির মূলে রয়েছে। সুতরাং দুর্যোগ নয়, প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বন্যাকে 'সম্পদ' হিসাবে দেখে এসেছে। নদীর রোষ ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নদীর জলের বাড়া-কমার সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে নদীর পাশে বসবাস করছে।

তুলনীয়— নদীর পাড়ে যাদের বাস, / ভাবনা তাদের বারোমাস।

বন্যার কারণ (Causes of Floods)

বন্যার কারণগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় তাদের মধ্যে কতকগুলি জলবায়ু ও আংশিকভাবে অন্য কোনো কারণের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়াও জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন কারণেও বন্যা হতে পারে। এই কারণগুলিকে নিম্নোক্ত সারণিতে দেখানো হল।

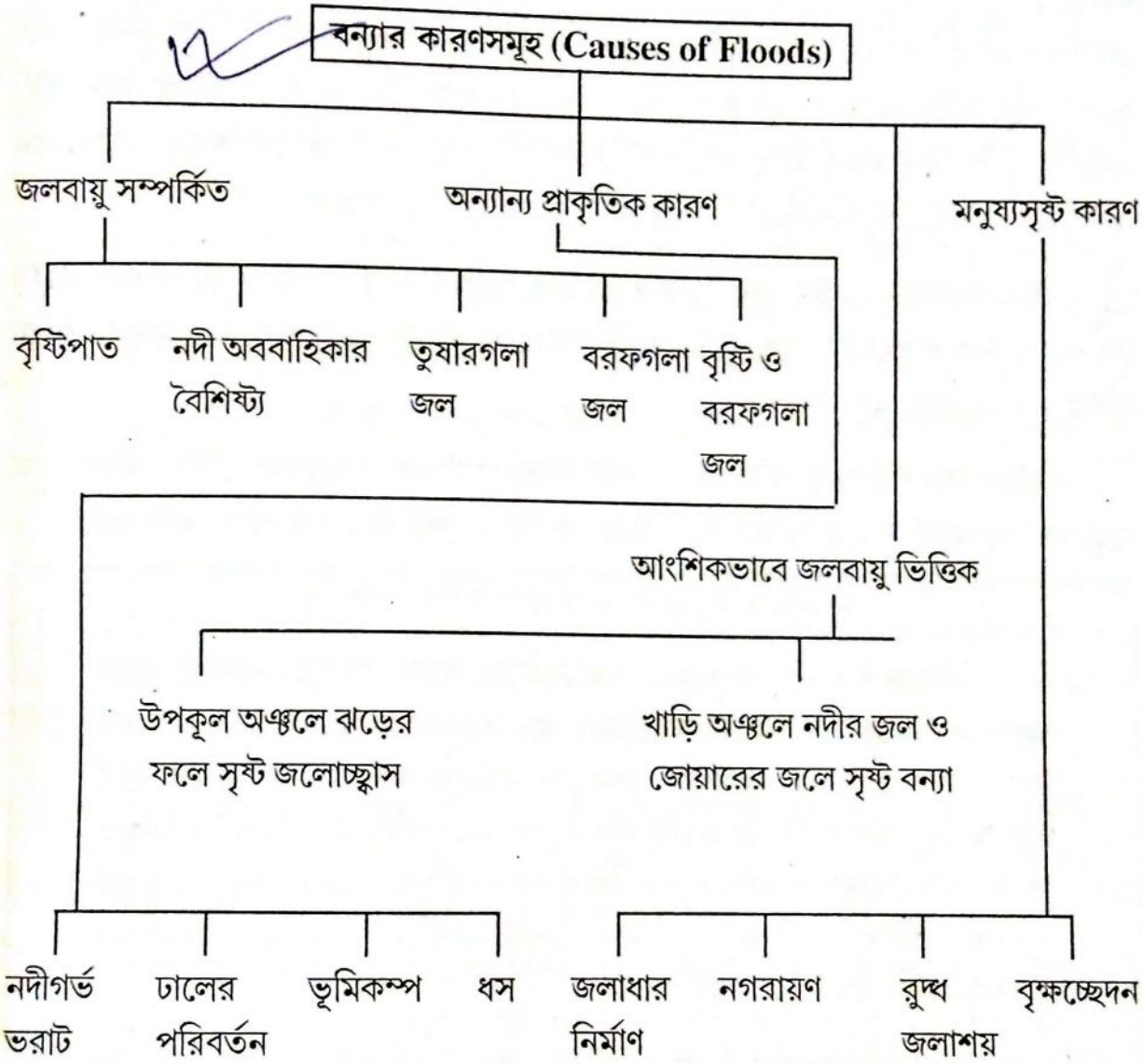

১। জলবায়ু সম্পর্কিত কারণ

বৃষ্টিপাত

কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা যথেষ্ট বেশি হলে সেখানে বন্যা হয়। এ প্রসঙ্গে 1999 সালের জলপাইগুড়ি শহরের বন্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই বছরের 9 জুলাই একদিনে জলপাইগুড়ি শহরে 474 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল যা বিগত

বছরের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। উল্লেখ্য 8 জুলাই, 1892 সালে জলপাইগুড়িতে 391 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। একদিনের অতিবর্ষণ যে ওই শহরে বন্যার অন্যতম কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোদ্দাকথা, বছরের কোনো এক সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি হলে বড়ো নদীতেও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোটো নদীর ক্ষেত্রে খুবই অল্প সময়ের ঝড়-বৃষ্টি থেকেও বন্যা হতে পারে। বেশি বৃষ্টির সময়ে বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে মাটির মধ্যে অনেক জল থেকে যাওয়ায় বাড়তি জল নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। একটানা বেশ কিছু সময় ধরে সমহারে বৃষ্টিপাতও বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। কোলম্যান (Colman, 1953) বৃষ্টিপাতজনিত বন্যাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন*।

দীর্ঘকালস্থায়ী বৃষ্টির কারণে বন্যা (Long rain flood) : এই ধরনের বন্যার কারণ হল কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ জুড়ে প্রায় সমহারে কম তীব্রতাযুক্ত বৃষ্টিপাত। সাধারণত বড়ো ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে এই বন্যা হয়।

হড়কা বান (Flash Flood) : এই বন্যা সাধারণত পরিচলন বৃষ্টির সাহায্যে বা বায়ুমণ্ডলে কোনো সীমান্ত সৃষ্টির ফলে হওয়া অবিরাম বৃষ্টিপাতের সাহায্যে হয়ে থাকে।

মহানন্দার হড়কা বানে ভাসতে পারে শিলিগুড়ি

মহানন্দার হড়কা বানে এবার ভেসে যেতে পারে শিলিগুড়ি শহরের বড়ো অংশ। এ বছরও হিলকার্ট রোড পুরোটা যান চলাচলের উপযুক্ত হবে না। এর কারণ, পাগলাঝোরায় মহানন্দার উৎসমুখে বড়োমাপের জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে। এই জলাধারটি যদি এখনই নষ্ট না করা হয় তাহলে 1968 সালের তিস্তার বন্যার মতো মহানন্দাও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। রবিবার এক প্রশ্নের উত্তরে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগের প্রতিনিধিদলের অধ্যাপক সুবীর সরকার।

শিলিগুড়ির ফুসফুস হিসেবে চিহ্নিত মহানন্দা নদী সৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ি শহর থেকে প্রায় 37 কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ি-কার্সিয়াং রুটের হিলকার্ট রোডের শিবখোলা বন থেকে। বাবুখোলা, পাগলাঝোরা ও শিবখোলার জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহানন্দা। মূলত ওই 3টি পাহাড়ি ঝোরার মিলনস্থল থেকে প্রায় 500 ফুট

* ল্যামবার্ট (Lambert 1956) বন্যার যে সাতটি ভাগ করেছেন তার মধ্যে তিনটি বৃষ্টিপাতজনিত। এগুলি হল যথাক্রমে : স্থানীয় পরিচলন বৃষ্টি ; ঘূর্ণ বৃষ্টি ; পার্বত্য এলাকার প্রভাবে শক্তিবৃদ্ধি পাওয়া ঘূর্ণ বৃষ্টি। তবে এই শ্রেণিবিভাগের সাহায্যে সবরকম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাকে যুক্ত করা যায়নি। বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়।

উঁচুতে রয়েছে হিলকার্ট রোডের লোয়ার পাগলাঝোরা এলাকা। 2010 সালের 16 জুনের বড়ো মাপের ধসের কারণে হিলকার্ট রোডের পাগলাঝোরা দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পাগলাঝোরায় সড়ক মেরামতের কাজ করছে। কিন্তু এ বছরও এই রুটে যান চলাচল করবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। কারণ যেভাবে ধস মেরামতের কাজ চলছে তা ক্ষতির তুলনায় উপযুক্ত নয়। এই এলাকার হিলকার্ট রোড ঠিক না হলে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং রুটে ট্রেনও চলবে না। পর্যটনেরও ক্ষতি হবে।

ধসের কারণ খুঁজতেই মূলত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের 4 ছাত্র সহ 8 সদস্যের একটি গবেষকদল অধ্যাপক ইন্দিরা লেপচার নেতৃত্বে শিবখোলা বনের মহানন্দার উৎসমুখে গবেষণা এবং অনুসন্ধান চালান। এই দলের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ইন্দিরা লেপচা ছাড়াও অধ্যাপক পি কে মণ্ডল এবং অধ্যাপক সুবীর সরকার।

এই গবেষকদলটি মহানন্দার উৎসমুখে লক্ষ করেন, একটি জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবেই। এই জলাধার সৃষ্টির কারণ, ধসের আবর্জনা। ধসের আবর্জনা সোজা নীচে ফেলা হয়েছে এতদিন। এই আবর্জনা পড়েছে ত্রিধারায় (বাবুখোলা, শিবখোলা এবং পাগলাঝোরা) দোভান (মিলনস্থল/মহানন্দার উৎসমুখে) বক্ষে। সেখানে প্রায় 4 হাজার বর্গফুটের জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে। এই জলাধারে কমপক্ষে এখন এক লক্ষ ঘনফুট জল জমে রয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র পাগলাঝোরাতেই জল রয়েছে। অন্য দুটি ঝোরা শুকনো। বর্ষা এখনও শুরু হয়নি।

এই জলাধারের বিপদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে গবেষকদলের সদস্য অধ্যাপক সুবীর সরকার জানান, এই জলাধারটিই বিপদ ডেকে আনতে পারে। বর্ষার সময় জলরাশি আরও বেড়ে যাবে। জলের চাপ বাড়বে। হঠাৎ করে বর্ষার সময় যদি এই জলাধার ভেঙে যায় তাহলে মহানন্দায় হড়কা বান দেখা দেবে। এমনটা হলে হিলকার্ট রোড দিয়ে ৬/৭ ফুট জল প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৬৮ সালের তিস্তা যেমনটা ঘটিয়েছিল জলপাইগুড়িতে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে সুবীরবাবু জানান, ওই জলাধারটি এখুনি যদি নষ্ট না করা যায় তাহলে বিপদ ঘটবে। শিলিগুড়িকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে হলে ওই জলাধারটি এখনই ভেঙে দিতে বড়ো বড়ো পাথর ভেঙে ফেলতে হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সুবীর সরকার জানান, ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত ধস হচ্ছে। কারণ মাটি ঝুরঝুরে। তা ছাড়া যেভাবে ধস মোকাবিলায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কাজ করছে তা উপযুক্ত নয়। এর ফলে নদীগর্ভে আবর্জনা বেশি করে জমা

হচ্ছে। ওখানে স্টীল ফ্রেম ও কংক্রিটের ঢালাই করে ধস মোকাবিলায় গার্ডওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরি। উপযুক্ত পদ্ধতিতে কাজ না হলে প্রতিবছর ধস হবে, দোভানে আবর্জনা জমবে। শিলিগুড়ি বিপদের মুখে চলে আসতে পারে। বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জরুরিভিত্তিক চিন্তাভাবনা করা উচিত।

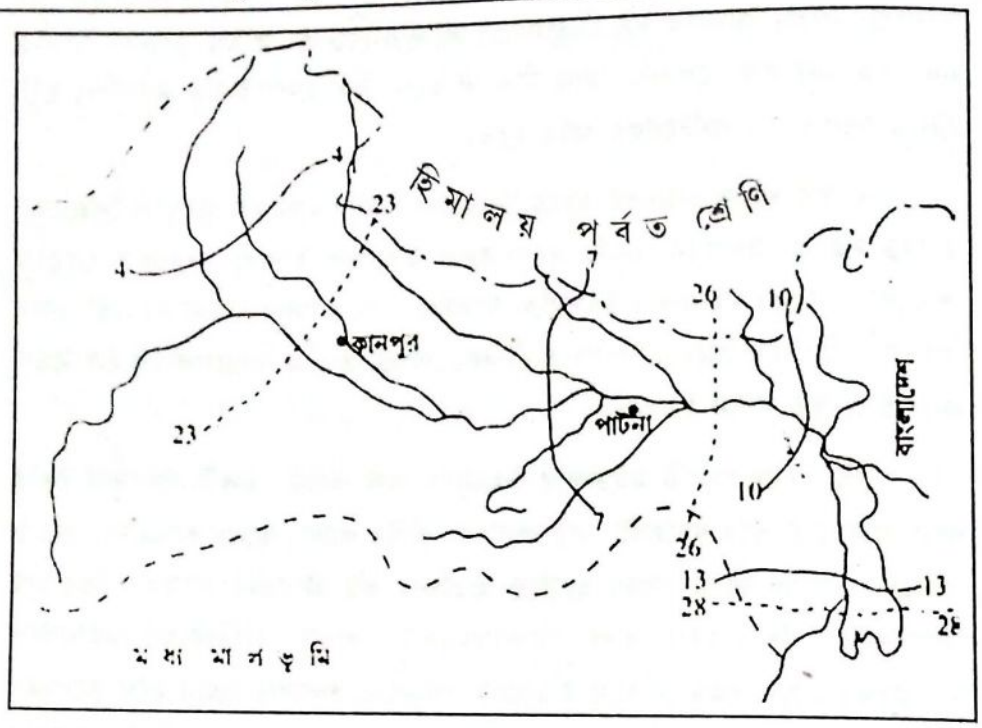

চিত্র 3 ঃ 1978-এর বন্যার সেপ্টেম্বর মাসের দিনভিত্তিক অগ্রগতি

দীর্ঘমেয়াদি বন্যার উদাহরণ 1978 সালে গঙ্গা অববাহিকার উচ্চগতি থেকে নিম্নগতি পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের বন্যার অগ্রগতি সমতারিখ (isodate) রেখা দ্বারা চিত্রে দেখানো হয়েছে। ওই বছর 1, 2 এবং 3 সেপ্টেম্বর তারিখে যমুনা নদীর ধারণ-অববাহিকা অঞ্চলে নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতে যমুনানদীর দু'কূল উপচে জল প্রবাহিত হয় এবং 4 সেপ্টেম্বর দিল্লি শহর প্লাবিত হয়। ধীরে ধীরে বন্যার জল অববাহিকার নীচের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ফলে মথুরা, বৃন্দাবন ও আগ্রা একের পর এক প্লাবিত হয়ে যায়। 7 সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ ও বারাণসী বিপদসীমার কাছে চলে আসে। কিন্তু দিল্লিতে জলের স্তর নেমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 10 সেপ্টেম্বর বারাণসী থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি প্লাবিত হয়। 11 সেপ্টেম্বর এই জলপ্রবাহ রাজমহল পাহাড় অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই অববাহিকা অঞ্চল পুনরায় প্লাবিত হয় যা বিন্দু রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। 22 সেপ্টেম্বর দিল্লি, আগ্রা, মথুরা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলতল বিপদসীমা অতিক্রম করে। 26 তারিখের মধ্যে বিহার পর্যন্ত গঙ্গার জলতল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর প্রধান কারণ হল অববাহিকার উচ্চ অংশ থেকে জলের আগমন।

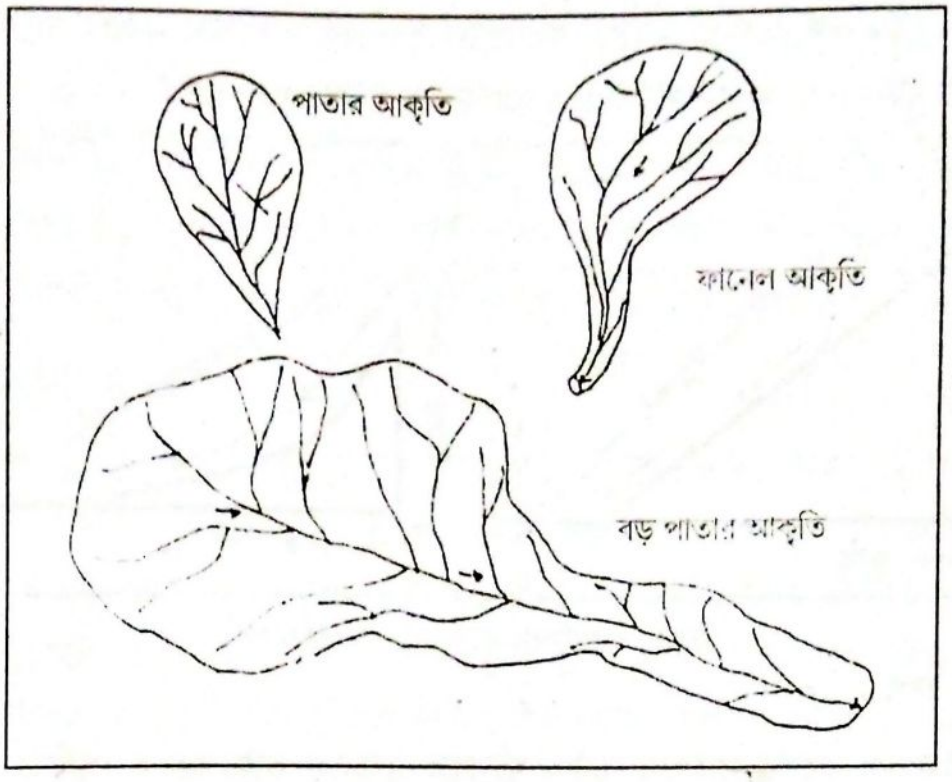

চিত্র 4 ঃ বিভিন্ন প্রকার নদী অববাহিকা

নদী অববাহিকার বৈশিষ্ট্য ও বন্যা :

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নদী অববাহিকা ও বন্যার মধ্যে সম্পর্কের কথা চলে আসে। এ প্রসঙ্গে নদী অববাহিকার আকৃতি, রৈখিক বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্রফলের সঙ্গে বন্যার সম্পর্কের কথা স্বভাবতই মনে আসে। আমরা জানি নদী অববাহিকার বিভিন্নাকৃতি নদীতে বন্যা তথা জল সরবরাহের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ''The shape of the drainage basin mainly governs the rate at which water is supplied to the main stream as it proceeds along its course from the source to the mouth.'' উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পাতার আকৃতি অববাহিকা (leaf shaped basin) কিংবা ফাঁদল (funnel) আকৃতির অববাহিকার তুলনায় বাঁধাকপি আকৃতির (Cauliflower) অববাহিকায় জল নিষ্কাশন তাড়াতাড়ি হয়। গঙ্গানদীর অববাহিকার আকৃতি ছড়ানো ছিটানো। এখানে গঙ্গার উচ্চগতিতে যদি বন্যা হয় তবে ওই জল পশ্চিমবঙ্গে নামতে কয়েক দিন লাগবে। সেই তুলনায় দার্জিলিং জেলার বালাসন নদীর উচ্চগতিতে যদি বন্যা হয় তবে তার জল মোটামুটি পরের দিনই শিলিগুড়িতে নামবে। কারণ বালাসন নদীর অববাহিকা অনেকটা পাতার মতো (leaf shaped)। নদী অববাহিকার ঢালের কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে, কারণ খাড়াই ঢালে জল নিষ্কাশন তাড়াতাড়ি হয়। ফলে উচ্চগতি থেকে বন্যার জল সহজেই নীচে নেমে এসে সমতলের বিস্তীর্ণ

এলাকাকে শীঘ্রই বন্যাপ্লাবিত করে। পক্ষান্তরে মৃদু ঢালু এলাকায় বন্যার প্রকোপ ততটা ক্ষতিকারক হয় না বা আগাম সর্তকতা পেলে মানুষ সর্তক হতে পারে।

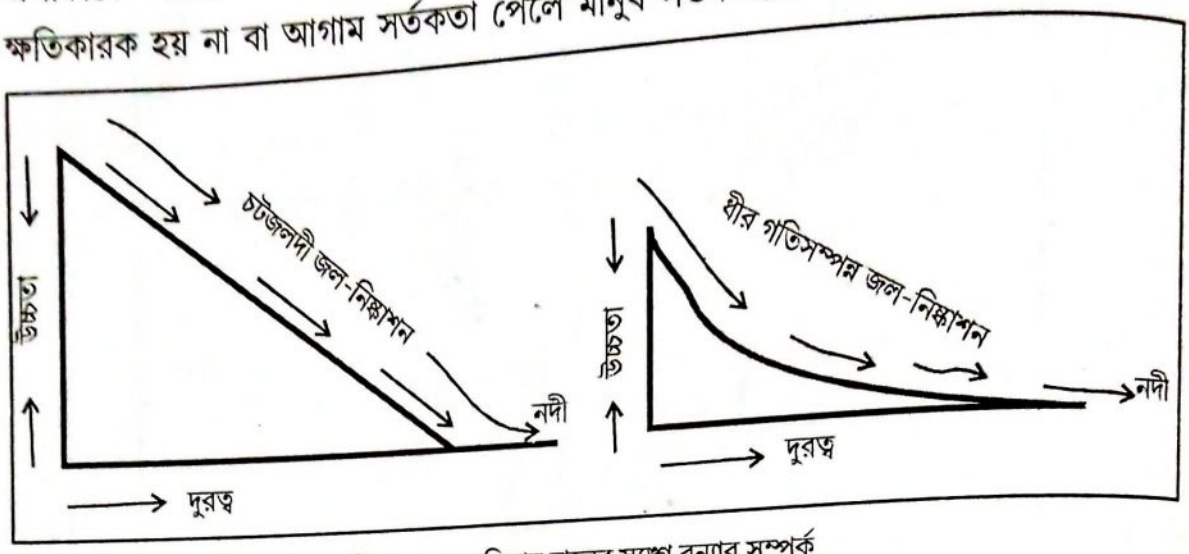

চিত্র 5 ঃ অববাহিকার ঢালের সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক

বরফগলা জল :

বরফগলা জলের সাহায্যে বন্যার ঘটনাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি : একটি হল (1) প্রায় চিরস্থায়ী মহাদেশীয় বরফের স্তরের অবস্থা সংক্রান্ত ও উপত্যকার হিমবাহের প্রভাব সংক্রান্ত এবং আর একটি হল (2) কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে নদীর জল জমে যাওয়া ও পরবর্তী ঋতুতে তার গলন। বরফ সাধারণত তুষারের তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে গলে। তাই কেবলমাত্র বরফগলা জলের কারণে ভয়ংকর বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম। হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলের নদীগুলির জলপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ করলে বোঝা যায়, এইসব নদীতে শীতকালে জলের পরিমাণ খুবই কম থাকে। কিন্তু মে থেকে জুলাই বা আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জলের প্রবাহ হঠাৎ খুব বেড়ে যায়।* শুধুমাত্র বরফগলা জলের সাহায্যে সবসময়ে বন্যা না হলেও পরোক্ষভাবে বরফগলা জল বা বরফের স্তূপ গলে যাওয়ার কারণে বন্যা হতে পারে। হিমবাহ সাময়িকভাবে এগিয়ে এসে অনেকসময় নদীতে বাধার সৃষ্টি করে ও বন্যা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

তুষারগলা জল :

বৃষ্টির জল ছাড়াও তুষার গলা জলও বন্যার কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশে এই কারণে বন্যা হয়। উচ্চ অক্ষাংশের ওই সব দেশগুলিতে খুব বেশি তুষারপাত হয়। ফলে সেখানে দীর্ঘ শীতকালের পরে যখন হঠাৎ তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশি উষ্ণতা থাকে, তখন সেখানে এই ধরনের

* ফরাসি নদীবিজ্ঞানী M. Parde নদীবর্তন (River Regime)-এর এই ধরনের ধাপকে Simple Regime বা সরল নদীবর্তন বলেছেন।

বন্যার সম্ভাবনা থাকে। ফন্ বা চিনুকজাতীয় স্থানীয় বায়ুর ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য হয়। এধরনের বন্যা নদীর নিম্নপ্রবাহের সমভূমি অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়। ইগার্কা এলাকায় ইনিসি নদীর নিম্নপ্রবাহে জুন মাসের গড় প্রবাহ 78,550 কিউসেকের (cf/s) মতো। শুধুমাত্র আমাজন নদীতে এর চেয়ে বেশি জল দেখা যায়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ফ্রেজার নদীতে 1948 সালের তুষারগলা জলের বন্যা এই জাতীয় বন্যার একটি উদাহরণ (রয় ওয়ার্ড, 1978)।

বৃষ্টি ও বরফগলা জল :

বৃষ্টি ও বরফগলা জলের মিলিত প্রভাবের ফলে বন্যা হতে পারে। এই জাতীয় বন্যার ক্ষেত্রে জলের দুটি উৎস থাকায় সহজে জল বেড়ে যায়। উচ্চ অক্ষাংশে বৃষ্টিপাতের অনেকটাই তুষারের আকারে জমা হয়। লক্ষ করে দেখা গেছে যে, 30 সেন্টিমিটার গভীর একটি তুষারের স্তর অনায়াসেই একটি বড়ো ধরনের বৃষ্টিপাতকে শুষে নিতে পারে যা পরবর্তীতে হঠাৎ খুব বেশি পরিমাণে জল তৈরি করে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ বন্যার তুলনায় এজাতীয় বন্যায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি জলপ্রবাহ লক্ষ করা যায়।

২। আংশিকভাবে জলবায়ু ভিত্তিক :

উপকূল অঞ্চলে ঝড়ের ফলে জলোচ্ছ্বাস :

মুক্ত উপকূল অঞ্চলে জোয়ারভাটার প্রভাবে প্রতিদিনই জল ওঠা-নামা করে কিন্তু ঝড়ের সময়ে এই সাধারণ ওঠা-নামার তুলনায় সমুদ্রের জলে বেশি স্ফীতি ঘটে এবং উপকূল অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়। ঝড়ের গতিবেগের ওপর এই জলস্ফীতি নির্ভর করে। নিম্ন অক্ষাংশের সমুদ্রে সৃষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবায়ুর ফলে হারিকেনজাতীয় ঝড় তৈরি হয়। এই হ্যারিকেন, টাইফুন এবং তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন আরও কিছু ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত উপকূল অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। ঘণ্টায় 120 কিলোমিটার থেকে 300 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবল বাতাসের ফলে সমুদ্রজল খুব বেশি উঁচু হয়ে ওঠে। সমুদ্রতলে স্বাভাবিক বায়ুচাপের পরিমাণ হল 1013.20 মিলিবার। লুজন-এ 1927 সালে একটি টাইফুনে সর্বনিম্ন কেন্দ্রীয় বায়ুচাপের পরিমাণ ছিল 886.56 মিলিবার। ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 126.6 মিলিবার বায়ুচাপের পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় 131 সেন্টিমিটার। স্মরণকালের মধ্যে বাংলাদেশে 1970 সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এক ঘূর্ণিঝড়ে 3 লক্ষ লোক মারা যায় এবং 750 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে 20 লক্ষ লোক কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খাড়ি অঞ্চলে নদীর জল ও জোয়ারের জলে সৃষ্ট বন্যা

অনেক সময় খাড়ি অঞ্চলে নদীর জল এবং সমুদ্রের জলের মিলিত প্রভাবে বন্যা সৃষ্টি হয়। খাড়িতে এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তার বেশিরভাগ সময়েই জোয়ারের জলের সঙ্গে নদীর জলের মিশ্রণের ফলে ওই জলতল বন্যা সৃষ্টির মতো বিশেষ অবস্থায় পৌঁছায়। বলা হয়ে থাকে যে ভরা কোটালের সময়ে জোয়ারের জল এত বেড়ে যায় যে নদীর জলের পরিমাণ কম থাকলেও ওই সম্মিলিত জলকে (মরা কোটাল ও নদীর জল) নদীখাতে ধরে রাখতে পারে না। আবার মরা কোটালের সময়ে যদি নদীর জলের পরিমাণ খুব বেশি থাকে তাহলেও উভয় জলে (মরা কোটাল ও নদীর জল) বন্যা হতে পারে।

৩। অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ :

নদীগর্ভ ভরাট

নদীগর্ভ ভরাট হয়ে গেলে নদীর জলবহন ক্ষমতা কমে যায়। ক্রমাগত নদীর পাড় ভেঙে গেলে নদীতে পলি জমা হয়। তা ছাড়া, নিম্নগতিতে বহন ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন নদীগর্ভেই পলি জমা হতে থাকে। ফলে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই নদী দুকূল ছাপিয়ে চারদিক জলমগ্ন করে বন্যা সৃষ্টি করে। দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলিতে এই কারণেই বন্যা হয়।

ঢালের পরিবর্তন

পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নামার সময় পর্বতের পাদদেশ (foot-hill) অঞ্চলে নদীর ঢালের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। ফলে পাহাড় থেকে আসা পলি নদীগর্ভেই পাদদেশ অঞ্চলে জমা হয়। নদীগর্ভ ভরাট হওয়ার দরুন উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়।

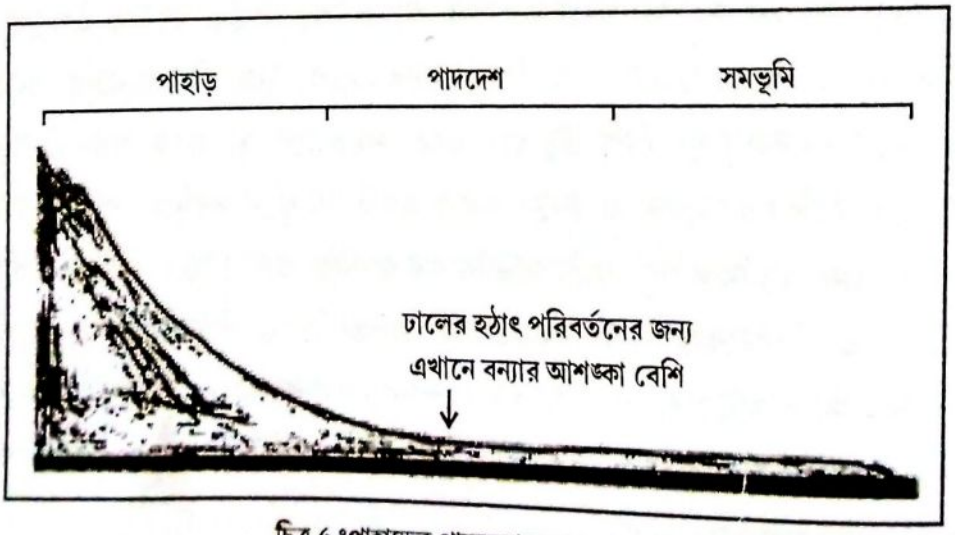

চিত্র ৬ ঃপাহাড়ের পাদদেশে বন্যার কারণ

ধস :

অনেক সময় দেখা গেছে পাহাড়ে ধস নামলে ও একটি বড়ো পাথরের টুকরো নদীগর্ভে পড়লে নদীর স্বাভাবিকগতি বন্ধ হয়ে যায় ও আপনা আপনি প্রাকৃতিক জলাধার তৈরি হয়। এরপর প্রবল চাপে যখন ওই বাধা (পাথরের টুকরো) সরে যায়, তখন প্রচুর পরিমাণে আবদ্ধ জল সমতলে নেমে এসে নদীর দুকূল প্লাবিত করে।

প্রাকৃতিক জলাধারের ভাঙনে বন্যা	
নদী	বছর
সিন্ধু	1841 ও 1858
বিরেগঙ্গা	1893
ভাগীরথী	1978
মালিপাগড় ও কালি	1998
সায়ক	1926 ও 1929
অলকানন্দা	1970
শতদ্রু ও বাগমতী	1993

নদীর গতিপথে যদি প্রচুর বাঁক থাকে তবে জলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। ফলে নদীর প্রবাহিত জল সহজে নিষ্কাশিত (Drain) হতে পারে না, তখন অতিরিক্ত জলপ্রবাহ (discharge) নদীর দু'পাড় ছাপিয়ে প্লাবন ঘটায়।

ভূমিকম্প :

অনেক সময় ভূমিকম্পও বন্যার কারণ হতে পারে। 1988 সালের 20 আগস্ট বিহারের কোশী ও কমলা বালান নদী বরাবর নির্মিত বাঁধে ভূমিকম্পের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং মধুবনী জেলার 50টি গ্রাম ও মুঙ্গের জেলার 30টি গ্রাম জলমগ্ন হয়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ :

(i) **জলাধার নির্মাণ :** বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। এতে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়। তাতে ফি-বছর পলি জমতে থাকে।* ফলে বাঁধের

* পরবর্তী (তৃতীয়) অধ্যায়ে আমরা দেখব দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় (DVC) যেসব জলাধার (পাঞ্চেৎ, মাইথন, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী) নির্মাণ করা হয়েছিল, তাতে কী বিপজ্জনক হারে পলি জমছে ও সেগুলির জলধারণ ক্ষমতা কত কমে গেছে।

জলধারণ ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই বর্ষার সময় জল ধরে রাখার পরিবর্তে ওই সব বাঁধ থেকে বাঁধ-কর্তৃপক্ষ জল ছাড়তে বাধ্য হন কারণ বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। বাঁধ বা জলাধার ভেঙে গেলে প্রলয়ংকরী বন্যা হতে পারে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বাঁধ ভেঙে বন্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচের সারণিতে দেখানো হল—

রাজ্য	বাঁধের নাম	বাঁধ ভাঙার বছর
মধ্যপ্রদেশ	কেদারনালা	1964
উত্তরপ্রদেশ	নানকসাগর	1967
কর্ণাটক	চিক্কাহোল	1972
তামিলনাড়ু	কোদানগর	1977
গুজরাট	মাচ্ছু-II	1979
গুজরাট	মিট্টী	1988

অনেক সময় দেখা যায় জলাধার তৈরির ফলে নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বন্যা হয়। 2000 সালে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার জন্য হয়েছিল। নিম্ন দামোদর অববাহিকায় বাঁধের জল ছাড়ার দরুন বন্যা প্রায় প্রতি বছরের রুটিন মাফিক ঘটনা। নিম্ন দামোদরে 1978 সালে এক মারাত্মক বন্যা ঘটেছিল। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসের 26 থেকে 29 তারিখ পর্যন্ত একটানা মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। এই বিপুল পরিমাণ জল জলাধারগুলিতে এসে জমা হয় ও বাঁধগুলিকে বিপন্ন করে তোলে। ফলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধগুলি থেকে জল ছাড়া শুরু হয়। নিম্ন দামোদর এলাকার নদীগুলি তখন এমনিতেই বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ছিল। বাঁধ থেকে ছাড়া অতিরিক্ত জলে সমগ্র নিম্ন দামোদর এলাকা ভেসে যায়। এর ফলে প্রায় প্রতি বছরই বহু লোক মারা যান এবং গবাদিপশু ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

অনুরূপভাবে মালদায় 1998 সালে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে প্রচুর জল ছেড়ে দেওয়ায় এবং অতিবৃষ্টির কারণে বিরাট বন্যা হয়। এই বন্যায় কোনো কোনো এলাকা একাদিক্রমে 10-15 দিন পর্যন্ত জলের তলায় চলে গেছিল।

(ii) নগরায়ণ : নদীর দুপাশে বসতি, কল-কারখানা গড়ে উঠলে কিংবা নদী উপত্যকায় চাষবাস শুরু হলে নদী স্বাভাবিক অবস্থায় যতদূর দুকূল ছাপিয়ে যেতে পারত তা বাধা প্রাপ্ত হবে। ফলে বর্ষার সময়ে নদী পলি জমা করে যে প্লাবন ভূমি তৈরি করতে পারত, তা আর হয় না। পলি নদীগর্ভে জমা পড়ে ও তা ভরাট করে বন্যার সৃষ্টি করে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদের বন্যা এ কারণে হয়।

(iii) **রুদ্ধ জলাশয় :** গ্রাম ও শহরের আশেপাশে জলাশয় ও জলাভূমিগুলি নির্বিচারে বুজিয়ে ফেলার জন্য বর্ষার জল ওই নীচু জমিতে জমার সুযোগ পায় না। ফলে বন্যা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খাল সংস্কার না করায় দক্ষিণ 24 পরগনার অনেক স্থানেই বন্যা হচ্ছে।

(iv) **বৃক্ষচ্ছেদন :** পাহাড়ি এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা*, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। ওই মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়ে। এজন্য নদীগর্ভ ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ে। এভাবে পলি পড়ে নদীখাত বুজে গেলে নদী বারবার সহসা গতি পরিবর্তন করে। উদ্ভিদের শিকড়গুলি মাটিকে ধরে রাখে। ফলে বৃষ্টির জল অনেকটা সময় ধরে চুঁইয়ে মাটির নীচে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করতে পারে। উদ্ভিদশূন্য পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টির জল ঢাল বেয়ে দ্রুত বেগে নীচের দিকে নেমে আসে, ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের তেমন একটা বৃদ্ধি হয় না।** উপরন্তু ভূমিক্ষয়ও বেশি হয়। ধসও নামে।

পরিবেশের ওপর বন্যার প্রভাব :

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে :—

- শস্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। শাকসবজি পচে যায়। ফলে মানুষ ও তৃণভোজী প্রাণীর খাবারে টান পড়ে।
- বন্যার স্রোতে কত পশু, মানুষ ভেসে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। বন্যার প্রকোপে বহু মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারায়।
- বন্যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পরিসেবা ব্যাহত হয়। রাস্তা ভেঙে যায়। রেললাইন ডুবে যায়। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা যায়। আন্ত্রিক, কলেরার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

---

* বৃক্ষের প্রকৃতির ওপর বৃষ্টির জলধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণত বড়ো বড়ো গাছ তাদের শেকড়ের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের মোট দুই-তৃতীয়াংশকে সঞ্চয় করে। সেই তুলনায় গুল্ম কিছুটা কম এবং ঘাস আরও কম জলধারণ করতে পারে। গাছ কাটার ফলে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ (infiltration) হ্রাস পায় ও পৃষ্ঠপ্রবাহ (surfacerun-off) বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাতের প্রায় 85% জল পাতলা পাতের (laminated flow) ন্যায় নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে নদীখাতের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত প্রবাহ বন্যার সৃষ্টি করে।

** অধিক ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে, যার ফলে নদীতে পলির পরিমাণ বাড়ে, নদীখাত ক্রমশ মজে যায় ও নদী-তলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এইসব কারণগুলির সম্মিলিত প্রভাবে কেবল বন্যাই সংঘটিত হয় না, বন্যার তীব্রতাও বাড়ে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে গত একশো বছরে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলিতে বন্যার সংখ্যা, বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে গঙ্গা সমভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও গঙ্গার উপনদীগুলিতে বন্যার প্রবণতা বেড়েছে।

ভারতে রাজ্যভিত্তিক বন্যায় বছরে গড় ক্ষতি

রাজ্যের নাম	গড় ক্ষতি কোটি টাকায়	রাজ্যের নাম	গড় ক্ষতি কোটি টাকায়
উত্তরপ্রদেশ	272.7505	তামিলনাড়ু	39.721
অন্ধ্রপ্রদেশ	257.0526	পশ্চিমবঙ্গ	37.5243
হিমাচলপ্রদেশ	221.3794	রাজস্থান	23.1291
কেরালা	212.0771	অরুণাচল প্রদেশ	19.2408
পাঞ্জাব	131.127	সিকিম	4.056
আসাম	130.9842	মধ্যপ্রদেশ	3.4401
ওড়িশা	124.9022	দমন এবং দিউ	3.234
বিহার	96.2399	পণ্ডিচেরি	2.7895
জম্মু ও কাশ্মীর	78.7265	মিজোরাম	2.088
কর্ণাটক	57.8416	মেঘালয়	1.45
গুজরাট	52.8501	ত্রিপুরা	0.963
মহারাষ্ট্র	49.1997	আন্দামান এবং	0.069
হরিয়ানা	48.1556	নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	
		মণিপুর	0.007

- এ ছাড়া খাদ্যশৃঙ্খল (food chain) ও খাদ্য জালিকা (food web) নষ্ট হয়।
- জল দূষিত হয়।
- মাটি দূষিত হয়। মাটি আম্লিক (acidic) হয়ে পড়ে।

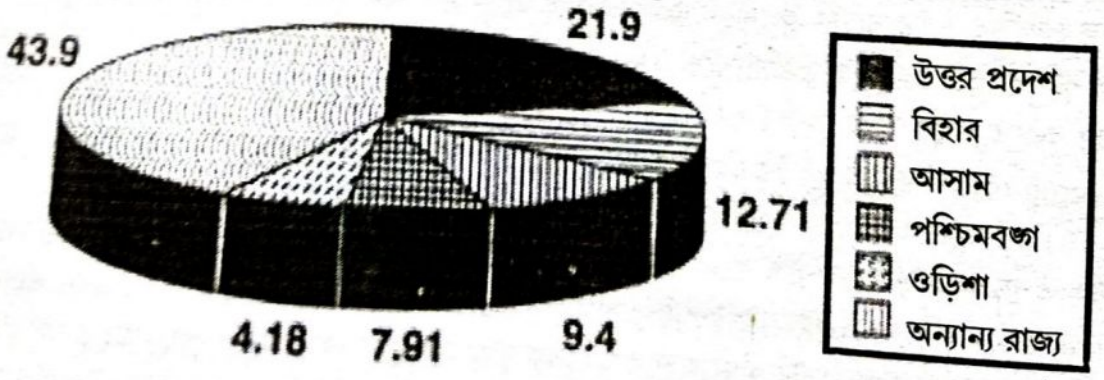

চিত্র 7 ঃ ভারতের বন্যাপ্রবণ এলাকা। মোট বন্যাপ্রবণ এলাকা 40 মিলিয়ান হেক্টর

বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Flood Control) :

1950-55 সালে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সারা ভারতে যা ছিল 1966-67 সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে; 1971-75 সালে তিনগুণ এবং 1976-78 সালে পাঁচগুণ বেড়েছে। মোট কথা, বন্যা একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ঘটনা। তাই একে রোধ করা যায় না, তবে চেষ্টা করলে কিছু পরিমাণ রোধ করা যায়। বন্যার ভয়াবহতা কমিয়ে দেওয়া যায়। নীচে এরকম কয়েকটি উপায়ের কথা বলা হল :—

(a) আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বৃষ্টি হবেই। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত যাতে মাটি ধুয়ে না নিয়ে যেতে পারে তার জন্য নদীর উচ্চ অববাহিকায় বনসৃজন করতে হবে।

(b) জলাধার বা Dam বানিয়ে বন্যার সময় নদীর জলের পরিমাণ কমানো যায়। জলাধারে জমা জল শুষ্ক ঋতুতে জলসেচের কাজে লাগানো যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি ও টেনেসি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রক জলাধার তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

(c) অত্যধিক নদী বাঁক বন্যা ঘটাতে সাহায্য করে। এজন্য বন্যা প্রবণ নদীর বাঁক কৃত্রিমভাবে কেটে সোজা করে দিলে বন্যার প্রকোপ কমে যাবে। মিসৌরি (Missouri) নদীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে খুব সুফল পাওয়া গেছে। তবে এই পদ্ধতি খুব ব্যয়সাপেক্ষ বলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটি প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে।

(d) বাঁধ ও বন্যা প্রতিরোধক দেওয়াল তৈরি করে নদীখাতের মধ্যে জলকে ধরে রাখা হয়। বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে এই ধরনের কৃত্রিম বাঁধ বানিয়ে নদী উপকূলবর্তী জনপদকে বাঁচানো যায়। পরের পাতার সারণিতে ভারতের রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন উচ্চতার বাঁধের সংখ্যা দেখানো হল। চিত্রে (নং 9) ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীর ধারে দেওয়া বাঁধ (Embanked) দেখানো হল।

(e) নদীকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে দিতে হবে। নদী উপত্যকায় যে-কোনো ক্ষতিকারক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। নদীর পাড়ে ভেড়ি বানানো চলবে না ইত্যাদি। দরকার হলে আইন বলবৎ করতে হবে। কারণ হিসেবে দেখা গেছে যে, নদীর মধ্যে বাঁধ দিয়ে ধীরে ধীরে নদী দখল করে চাষের জমি বা মাছের ভেড়ি তৈরি হয়। ফলে নদীর গতিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

(f) বাঁধের নীচে, নদনদীর নীচু অববাহিকায় বন্যার জল বিভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যারেজ তৈরি করা হয়। **'ঘাগর ভিন্নমুখ ব্যবস্থা'** (Ghaggar Diversion System) এমনই এক ব্যবস্থা। ঘাগর নদীর গতিপথে তৈরি এই ব্যারেজ বন্যার সময় 340 কিউমেক (কিউবিক মিটার প্রতি সেকেন্ডে) জল অন্যখাতে বইয়ে দিয়ে রাজস্থানে বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

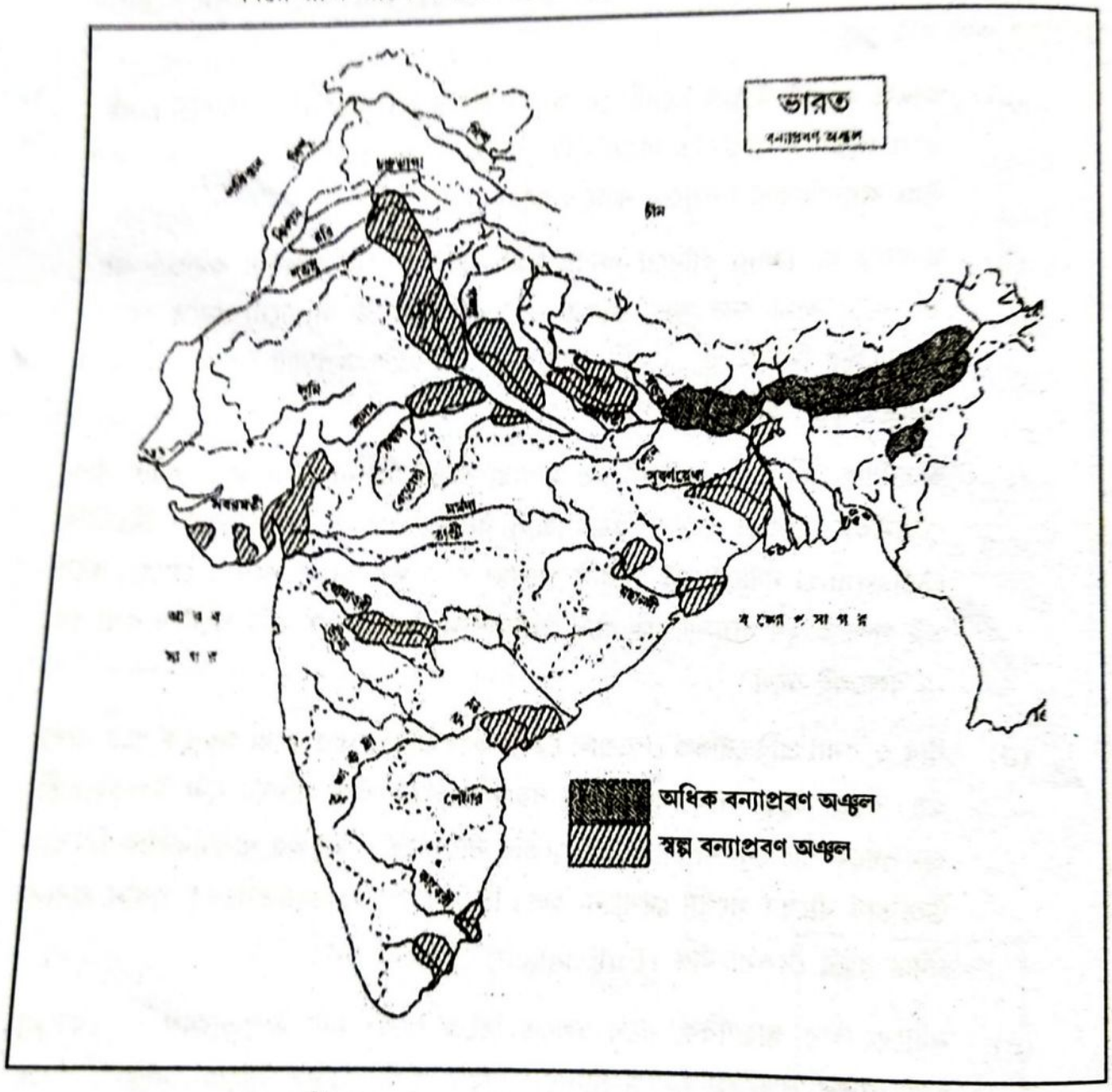

চিত্র 8 : ভারত বন্যাপ্রবণ অঞ্চল (Khuller অবলম্বনে)

(g) **বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্তকতা জারি করা :** ভারতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বেশ কিছুদিন ধরেই চলে আসছে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 1954 সালে কেন্দ্রীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (Central Flood Control Board) গঠন করেছে। বন্যা

4. **নদীর চরিত্র ঃ** সবশেষে আসি **নদীর চরিত্র** আলোচনায়। নদীর চরিত্রের উপর বন্যার প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিকে চরিত্র অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) উত্তরের বরফগলা জলে পুষ্ট নদী, যেমন—তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা ইত্যাদি।

(2) পশ্চিমে ছোটোনাগপুর মালভূমি থেকে উৎপন্ন বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী। যেমন—দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি।

(3) বদ্বীপের শেষপ্রান্তে উপকূলীয় নদীজালিকা যেখানে নদীগুলি মোহানা থেকে জোয়ার-ভাটার জলে পুষ্ট। যেমন— মাতলা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গের বন্যা

পূর্ব হিমালয়ের হিমবাহ থেকে সঞ্জাত তিস্তা নদীর কথা ধরা যাক। বর্ষাকালে এই নদীর জলস্রোতের তাণ্ডবে নদীতীরে শিলাস্তর ক্ষয় হয়ে নদীগর্ভে পতিত হয়। এইসব শিলাখণ্ড কখনও কখনও এত বিশাল আকারের হয় যে, তীব্র জলরাশির বেগও একে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে এই শিলাখণ্ডগুলি অস্থায়ী বাঁধের আকার নেয়। এই প্রাকৃতিক বাঁধের পিছনে ভেসে আসা গাছপালা, আরও অনেক কিছু জমে যায় এবং সেই সঙ্গে এর পিছনে জল জমতে জমতে স্বাভাবিক জলাধারের রূপ নেয়। কিন্তু জলের চাপে এই বাঁধ হঠাৎ একসময় ভেঙে গেলে, বিশাল জলোচ্ছ্বাস নদীগর্ভে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে।

1968 সালে তিস্তা নদীর জল অনেক উঁচুতে কালীঝোরা বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বন্যার তাণ্ডবে তিস্তাবাজার ও সেবকের সেতুগুলি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। সবশেষে এই বিশাল জলরাশি তরাই সমভূমিতে নেমে আসে ও জলপাইগুড়িতে প্রলয়ংকরী বন্যায় প্রচুর জীবন ও সম্পত্তি হানি হয়। পাহাড়ে জ্বালানির জন্য বনভূমি কর্তন, অতিবৃষ্টিতে ধস নামা, নদীগর্ভে স্বাভাবিক বাঁধ সৃষ্টি—সবকিছু মিলে যে বন্যা ঘটে, তা রোধ করতে হলে বনভূমি সংরক্ষণ এবং মানুষের পরিবেশবান্ধব (Ecofriendly) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (যা ধসের মতো দুর্যোগকে ত্বরান্বিত করে না) করা খুবই জরুরি।

দক্ষিণবঙ্গের বন্যা

অনেক সময়ে দেখা যায় অতিবর্ষণ হয়নি কিন্তু সমভূমিতে নদীগর্ভ ক্রমাগত আবর্জনা ফেলার ফলে ভরাট হয়ে যায় এবং নদীখাতের ঢাল খুব কমে যায়। ফলে জলনিষ্কাশন সঠিক গতিতে হয় না এবং বন্যা ঘটে।

ছোটোনাগপুর থেকে আসা নদীগুলিতে বর্ষাকালে জলস্ফীতি দেখা যায়। কিন্তু এরা যখন প্রবল জলধারা নিয়ে পূর্বদিকে ধাবিত হয়, তখন সেই গতির পক্ষে বাধা হিসেবে দাঁড়ায়, আড়াআড়িভাবে নির্মিত রেলপথ, রাজপথ ইত্যাদি। এই রেলপথ বা রাজপথের নীচে জল নিষ্কাশনের পথগুলি খুব ছোটো এবং অধিকাংশই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় বুঁজে গেছে। ফলে এর মধ্য দিয়ে দ্রুত জলনিষ্কাশন সম্ভব হয় না। এই ঘটনা বর্তমানে প্রায়শই ঘটে।

উত্তরবঙ্গে পাহাড়ে তৈরি রেলপথের জন্য জলপাইগুড়ি, কোচবিহারেও বন্যা হয়।

গঙ্গার বদ্বীপে দক্ষিণ দিকের নদীগুলি প্রায় পুরোটাই জোয়ারের জলে পুষ্ট। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বন কেটে বসত তৈরি করার জন্য নদীর দু'ধারে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। কিন্তু বর্ষাকালে ঘূর্ণবাতের প্রভাবে যখন বিপুল জলরাশি নদীর ভেতরে ঢুকতে থাকে, তখন এই বাঁধগুলি জলের চাপে ভেঙে পড়ে এবং দু'কূল উপচিয়ে বন্যা ও ভূমিক্ষয় ঘটে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে বর্তমানে বন্যা আর কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মানুষের অপরিণামদর্শিতা এই দুর্যোগের পিছনে সমানভাবে দায়ী।

বন্যা প্রতিরোধ

বন্যা প্রতিরোধ করতে হলে দরকার নদীর চরিত্র এবং সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আছে, সেটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। এর জন্য অভিনিবেশসহকারে জানতে হবে—

(1) নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় মোট জলের পরিমাণ।

(2) ওই অঞ্চলে ভৌমজলের অবস্থা ও পরিমাণ এবং ভৌমজলের ঋতুগত ও উচ্চতাগত তারতম্য।

(3) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও নদীর জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক।

(4) ধারণ অববাহিকায় জলপ্রবাহের গতিবেগ।

(5) নদী অববাহিকার আয়তন, আকৃতি, ভূমিঢাল, গড় উচ্চতা, এবং অববাহিকার চরিত্র—অর্থাৎ নদীর ঘনত্ব, নদী অববাহিকায় অবস্থিত জলাধার ও পুষ্করিণীর সংখ্যা।

(6) নদী দ্বারা বাহিত পললরাশির পরিমাণগত প্রকৃতি ও তাদের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ।

(7) মৃত্তিকার উপাদান।

(8) নদী উপত্যকায় জলের recharge ও discharge কীভাবে হয়।

এই বিষয়গুলি বোঝার জন্য অনেকরকম গাণিতিক হিসাব ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। এইসব হিসাব ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় জলপ্রবাহের লেখচিত্র (যেমন—হাইড্রোগ্রাফ, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, রেটিং কার্ভ ইত্যাদি) অঙ্কন করা যায়। এই পদ্ধতিগুলিকে কাজে

লাগিয়ে সম্ভাব্য বন্যা সম্বন্ধে মানুষ সতর্ক হতে পারে। তা ছাড়া নগরে, শিল্পাঞ্চলে জলের জোগান, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ব্যবস্থা, জলভিত্তিক আমোদ-বিনোদন, নৌপরিবহণ, মৎস্যসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও সাহায্য পাওয়া যায়।

বন্যার ক্ষতিকারক প্রভাব

প্রতিবছর পৃথিবীতে বন্যার ফলে প্রায় 20,000 লোকের মৃত্যু হয় এবং 20 মিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশিরভাগই গৃহহারা বা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি ঘটে। নিম্নের সারণি থেকে এশিয়া ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

1900-2006 সময়ের মধ্যে বন্যার প্রভাবের শতাংশের হিসাব—

মহাদেশ	বন্যার সংখ্যা (%)	মানুষের মৃত্যু (%)	আহতের সংখ্যা (%)	গৃহহারার সংখ্যা (%)	প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা (%)	অর্থনৈতিক ক্ষতি (%)
আফ্রিকা	17	0.5	2	4	1	1
দুই আমেরিকা	25	1	3	3	2	17
এশিয়া	41	98	93	91	96	58
ইউরোপ	14	0.5	2	2	1	23
ওশিয়ানিয়া	3	—	—	—	—	1

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium-এর তথ্য সারণি থেকে গৃহীত।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে চীন এবং বাংলাদেশ হল বন্যার প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দেশ।

বন্যার জলে ডুবে মানুষের মৃত্যু হয়। বন্যার সময় মানুষ ও প্রাণীরা একইসঙ্গে কোনো উঁচু স্থান বা গাছে আশ্রয় নেয়। এইসময় সাপের কামড়েও অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এইসময় সাপের কামড়েও অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এইসময় নিকাশি ব্যবস্থায় দূষিত জল, কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক প্রভৃতি বন্যার জলে মিশে যায়। জলের উৎস যেমন পুকুর, কুয়ো, নলকূপ প্রভৃতি জলে ডুবে গিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের আকাল দেখা দেয়। ফলে আন্ত্রিক, কলেরা প্রভৃতি রোগ মহামারী হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে, বহু মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এছাড়াও টাইফয়েড প্রভৃতি জলজনিত রোগ বা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মশাজনিত রোগ ছড়িয়ে পড়েও পরিস্থিতি ভয়ংকর করে তোলে। চোখের সামনে নিজস্ব সম্পত্তির ধূলিসাৎ হওয়া বা প্রিয়জনের মৃত্যু দেখা মানুষ মানসিকভাবেও

বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বন্যার ফলে শস্যহানি হয়। পাড় ভাঙন বা ভূমিক্ষয়ের সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।

বন্যার উপকারী প্রভাব

খুব তীব্র আকার ধারণ না করলে, বন্যার ফলে মানুষ ও পরিবেশের কিছু উপকারও হয়। বন্যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে নতুন পলির আস্তরণ পড়ে, ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে। এছাড়া একটানা কৃষিকার্য চলতে চলতে কৃষিক্ষেত্রের মাটি নোনা হয়ে যায়। বন্যার জল সেই নুন ধুয়ে দিয়ে কৃষির উপকার করে। বন্যার অতিরিক্ত জলের শক্তি অনেকসময় নদীখাতের জমা পলি সরিয়ে দিয়ে নদীকে মজে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। বর্ষার অতিরিক্ত জল বাঁধ ও জলাধারের সাহায্যে ধরে রাখতে পারলে শুষ্ক সময়ে জলসেচের কাজে লাগে। নদী ও জলাশয়গুলি ভরে যাওয়ার ফলে মাছ চাষ ও মাছ ধরার সুবিধা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বন্যার মানচিত্র, হাইড্রোগ্রাফ, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, রেটিং কার্ভ ইত্যাদি কীভাবে অঙ্কন করা যায় সেই আলোচনা করব।

বন্যার মানচিত্র অঙ্কন

বন্যার মানচিত্র অঙ্কন নির্ভর করবে বন্যাসম্পর্কে কী ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে তার উপর। আবার ওই তথ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে ওই মানচিত্র ভবিষ্যতে কীভাবে কাজে লাগবে।

বন্যার মানচিত্র দু'ভাবে করা যেতে পারে—

(1) কোনো একটি নির্দিষ্ট বন্যার ঘটনা মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা।

(2) কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ধরে, যেমন— গত 50 বছরে বিভিন্ন এলাকা কতবার করে বন্যাকবলিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির হার বার করা। এভাবে কোন এলাকা কতটা বন্যাপ্রবণ তা বার করা যাবে।

(1) **কোনো একটি নির্দিষ্ট বন্যা ঃ** ধরা যাক 2000 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 6.দিন টানা বৃষ্টি চলার পর, নদীর জল উপচে, পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলা বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে। এবারে মানচিত্র কীভাবে করা যাবে তা দেখা যাক—

(ক) প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গে ওই দিনগুলিতে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৃষ্টিপাত কত হয়েছিল তা মানচিত্রে বসিয়ে আইসোহাইট বা সমবর্ষণ রেখা টানতে হবে।

(খ) যদি উচ্চতা, সমোন্নতি রেখা বা spot height পাওয়া যায়, তাই দিয়ে বন্ধুরতার একটি মানচিত্র করা যেতে পারে।

(গ) এবারে পশ্চিমবঙ্গে নদনদী দেখিয়ে একটি মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে।